দাম : ষোলো টাকা

ভারতবাসীর কাছে এক
পরম শ্রদ্ধার দিন
পঁচিশ ডিসেম্বর— পৃঃ১৩

স্বস্তিকা

তুলসীপূজন দিবস
পালনের গুরুত্ব
—পৃঃ ২৩

৭৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪।। ৭ পৌষ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

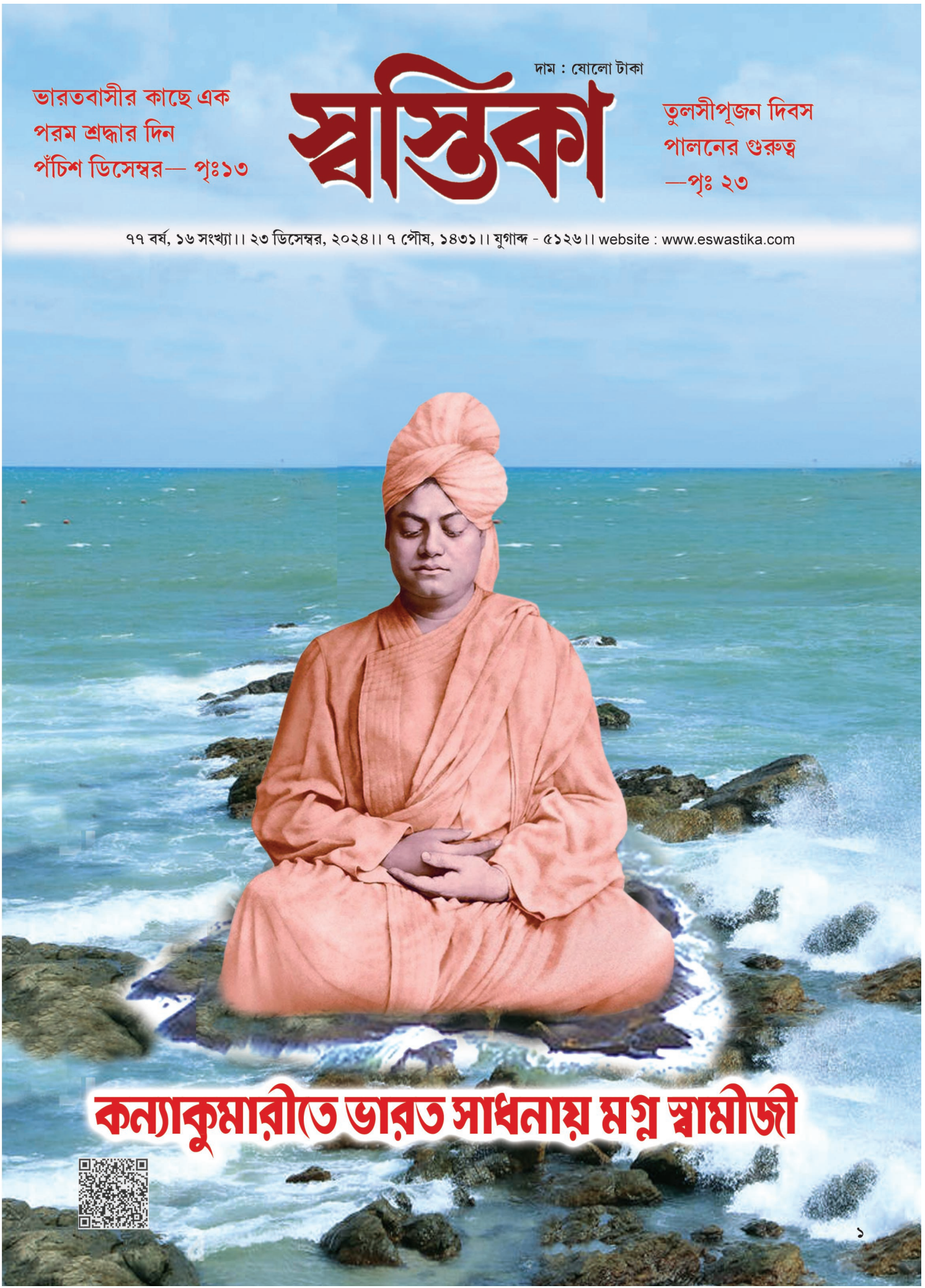

কন্যাকুমারীতে ভারত সাধনায় মগ্ন স্বামীজী

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ৭ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

২৩ ডিসেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

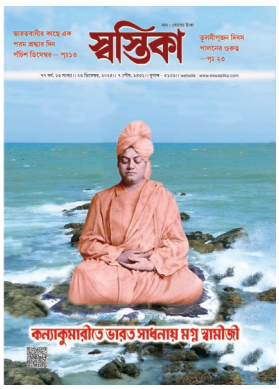

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সিবিআই-এর ব্যর্থতা নাকি মমতা ব্যানার্জির অসহযোগিতা ? ঘিরে ধরে হতাশা যখন □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ফিরহাদ তো ছক ফাঁস করে দিল দিদি! □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

রাষ্ট্রভক্তির পুরোধাপুরুষ ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার □ মধুভাই কুলকর্ণী □ ৮

বাংলাদেশের পরিস্থিতির সুযোগে পাকিস্তানে চিকিৎসা-নগরীর পরিকল্পনা চীনের □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ইসলামি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে আগুন জ্বলছে □ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল □ ১১

ভারতবাসীর কাছে এক পরম শ্রদ্ধার দিন পঁচিশ ডিসেম্বর □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী □ ১৩

ধুনি জ্বেলে ত্যাগব্রতের সংকল্প □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ১৫

মনগড়া কাহিনি না বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ? □ বিপ্লব বিকাশ □ ১৬

ক্রিসমাস উৎসব এবং পরিবেশগত কুপ্রভাব □ ড. অলি ব্যানার্জি □ ১৮

তুলসীপূজন দিবস পালনের গুরুত্ব □ মিলন খামারিয়া □ ২৩

ত্রিপুরার স্থপতি মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মন □ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী □ ৩১

শৈবক্ষেত্র ভদ্রেশ্বর □ অর্ণব দাস □ ৩২

পঁচিশ ডিসেম্বর—এক রাষ্ট্রনায়কের জন্মদিন □ দেবজিৎ সরকার □ ৩৫

সময় যত গড়াচ্ছে, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার তত তীব্র হচ্ছে □ শিতাংশু গুহ □ ৩৭

বঙ্গের সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ □ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৮

পঁচিশ ডিসেম্বর ভবিষ্যৎ ভারতের সাধনায় ধ্যানমগ্ন স্বামীজী □ তিলক সেনগুপ্ত □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০ □ খেলা : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৫-৫০

প্রকাশিত হবে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন

দেশভাগ তথা স্বাধীনতার আগে থেকেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা জেহাদি আক্রমণের শিকার। ভারত বিভাজনের পর তারা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তাদের সম্পত্তি হয়েছে শত্রু সম্পত্তি। নিজভূমে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত হয়েছে। পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হওয়া স্বাধীন বাংলাদেশেও তাদের ওপর আক্রমণ, নির্যাতন ঘটে চলেছে। সম্প্রতি জেহাদি অভ্যুত্থানে সেটা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করবেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০/- + ৩৬০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০/- + ৮৫০/- রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পরধর্ম ভয়াবহ

বিশ্বের বহু পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে, মানব সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছে ভারতবর্ষে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ সেই সভ্যতার বিকাশ ঘটাইয়াছেন। শিক্ষায়দীক্ষায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে, ধনসম্পদে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আত্মজ্ঞানী ঋষিগণের উদাত্ত আহ্বান ছিল 'কৃণ্বন্তু বিশ্বমার্যম্'। অর্থাৎ বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ করিতে হইবে। ভারতের সাধনালব্ধ জ্ঞান লইয়া বিশ্বও অগ্রগতির পথে চলিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিরও বিশ্বসঞ্চার ঘটিয়াছিল। বিশ্ব তখন ভারতকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বের নবীন জাতিগুলির লোভ পড়িয়াছিল ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির উপর। তাহারা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে। লুণ্ঠন করিয়াছে ধনসম্পদ। দেবালয় ভগ্ন করিয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়াছে। নারীজাতির সম্ভ্রমহানি করিয়াছে। দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। একসময় এই দেশের শাসক হইয়া বসিয়াছে। এইভাবে তুর্কি-পাঠান-মুঘল, ফরাসি, পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ আসিয়াছে। ইংরাজও ছলে-বলে-কৌশলে দেশের শাসক হইয়া বসিয়াছে। তাহারা মন্দির দেবালয় ভগ্ন করে নাই সত্য, কিন্তু তাহারা সেবার আড়ালে, শিক্ষার আড়ালে এই দেশের মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে তাহারা কিছুটা হইলেও সফল হইয়াছে। তৎকালীন শিক্ষিত যুবসমাজের একাংশ খ্রিস্টীয় মতে আকৃষ্ট হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। একটি সময় স্বধর্ম ত্যাগ করিবার এবং খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার হিড়িক পড়িয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের তৎপরতায় তাহা কিছুটামাত্র স্তিমিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর শতবর্ষ কালখণ্ড ধরিয়া ইংরাজ শাসকের আনুকূল্যে ভারতবাসীর ভাষাগত, সংস্কৃতিগত স্বাভিমান নষ্ট করা হইয়াছে। ইহার বড়ো প্রমাণ হইল স্বীয় ধর্ম সংস্কৃতিকে বিদ্রূপ করিয়া ফিরিঙ্গি উৎসবে মাতিয়া ওঠা। রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াণের পরে এই বঙ্গভূমিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব। তিনি শিক্ষিত যুবসমাজকে স্বধর্মবোধে জারিত করিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা পরাধীন, স্বাভিমানশূন্য জাতির মনে দেশ ও ধর্মের প্রতি প্রেম জাগ্রত করিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যমণি স্বামী বিবেকানন্দ জাতির স্বাভিমান ও আত্মচৈতন্য জাগ্রত করিলেন। গুরুভ্রাতাদের লইয়া খ্রিস্টীয় উৎসবের প্রাক্কালে ভারতোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পর ভারত ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি ভারত ভূখণ্ডের শেষ শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া ভারতবর্ষের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ভারত ভ্রমণকালে তিনি দেখিয়াছিলেন, বর্বর আক্রমণকারীরা কত মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ধ্বংস করিয়াছে। অনুভব করিয়াছেন, ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা স্বর্ণময় ভারত কীভাবে লুণ্ঠিত হইতেছে। স্বীয় চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ভারতবাসী কীভাবে দারিদ্র ও রোগব্যাধিতে দিন অতিবাহিত করিতেছে। কীভাবে শিক্ষিত মানুষেরা ব্রিটিশ প্রভুদের সেবা করিতেছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তিনদিন তিনরাত্রি তিনি কন্যাকুমারী শিলাখণ্ডে ধ্যানমগ্ন রহিলেন। ধ্যাননেত্রে তিনি অনুধাবন করিলেন, ভারতমাতা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়া জগতের সিংহাসনে আরূঢ় হইতেছেন। উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, স্বামীজী ধ্যাননেত্রে ভারতবর্ষের উত্থানের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা খ্রিস্টীয় উৎসবের মধ্যেই। তিনি নিশ্চয় জাতিকে বার্তা দিয়াছিলেন, বিদেশি সংস্কৃতির হুল্লোড়ে মাতিবার দিন নহে, ভারতের উত্থানের নিমিত্ত সাধনার দিন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে জাতির আত্মচৈতন্য বহুলাংশে ঘটিয়াছে। স্বামীজীর প্রেরণাকে পাথেয় করিয়া শতবর্ষ ব্যাপী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যের ফলে জাতির স্বাভিমানও বহুলাংশে জাগ্রত হইয়াছে। তথাপি স্বাভিমানশূন্য মানুষের সংখ্যাটিও কম নহে। আজও একটি খ্রিস্টীয় উৎসবে এই স্বাভিমানশূন্য লোকেরা আদেখলাপনা করিয়া থাকে। তাহাদের সামলাইতে কয়েকশত পুলিশকর্মীর প্রয়োজন হইয়া থাকে। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এই আদেখলাপনা, তাঁহার জন্মদিনের নির্দিষ্ট প্রমাণ গবেষকগণ খুঁজিয়া পান নাই। অদ্যাবধি মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে তাঁহার জন্মদিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। স্বাভিমানশূন্য ব্যক্তিরা গীতোক্ত বাণী 'পরোধর্মো ভয়াবহঃ'-র মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারে নাই। ইহা বড়োই বেদনার বিষয়। তবে সুখের বিষয় যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আশীর্বাদে জাতির যে জাগরণ ঘটিয়াছে, তাহাতে দেশ অগ্রগতির পথে চলিতে শুরু করিয়াছে। ফলত অবশিষ্টাংশেরও খুব শীঘ্রই মোহভঙ্গ হইবে এবং চৈতন্যোদয় ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।

সুভাষিতম্

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।। (শ্রীশ্রীগীতা ৩।৩৫)

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম হতে গুণরহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকারক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।

সিবিআই-এর ব্যর্থতা নাকি মমতা ব্যানার্জির অসহযোগিতা ?

ঘিরে ধরে হতাশা যখন

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আরজি কর ঘটনায় অভিযুক্ত দুই চক্রীর বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেয়নি সিবিআই। মূল তদন্ত যাতে গুলিয়ে না যায় তা এড়াতেই এই ব্যবস্থা। সুষ্ঠু তদন্তের বহু অন্তরায়। এ রাজ্যে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ সিবিআই, তাই সন্তর্পণে পা ফেলতে চাইছে। সিবিআইয়ের সর্বশেষ অবস্থান কি বিশ্বাসযোগ্য? কেন্দ্রীয় বিজেপির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁতাতের আজগুবি তত্ত্ব দানা বাঁধছে। মানুষ বলছে সিবিআই ইচ্ছা করে চার্জশিট দেয়নি। এক দেশ এক ভোট বিল আর অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রণয়নে মমতার ২৯ সাংসদের বিরোধিতা এড়াতে। শিল্পপতি গৌতম আদানি আর সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান বেশ ঘোলাটে। এই মুহূর্তে মমতার গোদের ওপর বিষফোড়া বাংলাদেশ। হিন্দু নিধন আর সংখ্যালঘুদের উপর মোল্লাবাদী নির্যাতন।

দায়িত্ব রহিত হতে মমতা সে বল কেন্দ্রের কোর্টে ঠেলেছেন। চার মাসের মধ্যে আরজি কর ঘটনায় আটকদের মধ্যে কেবল একজন অভয়ার খুন আর ধর্ষণে অভিযুক্ত। সেই সিভিক এবং সন্দীপ ঘোষ-সহ দোষীদের বাঁচাতে গোটা মমতা প্রশাসন নেমে পড়েছে। কেন? বাকিরা তথ্য লোপাট আর অর্থনৈতিক দুরাচারের দায়ে অভিযুক্ত। ১৯৯৩ সালে ভিক্টোরিয়া চটকলের শ্রমিক ভিখারি পাসোয়ানের অন্তর্ধান সমাধান করতে পারেনি সিবিআই। গত ৩১ বছরের মধ্যে অধিকাংশ তদন্তে— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি; ভারতীয় নিউজিয়াম থেকে বুদ্ধদেবের মূর্তি চুরি, সারদা, নারদা, রোজভ্যালি আর অন্য চিট ফান্ড দুর্নীতি মামলা সবেতেই সিবিআই ব্যর্থ হয়েছে। তার সুযোগ নিয়েছে সমসাময়িক রাজ্য সরকারগুলি। তখন সিপিএম আর এখন মমতা সরকার। তাই এটা ভাবার সময় এসেছে আরজি কর মামলা কি সিবিআই-এর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেবে? তাদের যোগ্যতা প্রমাণের এটাই শেষ সুযোগ। তাতে ব্যর্থ হলে রাজ্য থেকে দপ্তর গুটিয়ে চলে যাওয়া দাবি ওঠা স্বাভাবিক।

আরজি কর মামলায় মমতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিজেপির আজগুবি আঁতাতের তত্ত্ব— কলকাতা থেকে বর্ধমান একশো কিলোমিটার হলে আমার পিতার বয়স কত গোছের সমীকরণ। রাজ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটার মমতা বিরোধী। বাকি ৬০ শতাংশের পুরো মমতার সঙ্গে নেই। মমতার ভোট আনুমানিক ৪৭ শতাংশ। বাকিটা অপ্রাসঙ্গিক কংগ্রেস আর বাম দলের। বিজেপির দাবি, গত লোকসভা ভোটে রাজ্যে ৮০ হাজার বুথের মধ্যে ৩০ হাজার বুথে তারা তৃণমূলের কাছে মাত্র ১০০ ভোটে হেরেছে। ভোট কাটাকাটিতে ১২টি লোকসভা তাদের হাতছাড়া হয়েছে। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটের জন্য তারা বুথ সম্পর্ক অভিযান শুরু করেছে। ভোটের অঙ্কে এগিয়ে থাকায় মমতা মানুষকে বহু কিছু ভুল বোঝাতে পারেন। অনেকে তাঁকে 'ম্যানেজ মমতা' বলেন।

কেন্দ্র, রাজ্য বা পররাষ্ট্র সবেতেই মমতা ক্ষমতা ম্যানেজ করেন। আর ঠিক সেই কারণেই মানুষ হতাশ। তিনি সিবিআইকেও ম্যানেজ করে ফেলবেন। রাজনীতিক হিসেবে তার ছলচাতুরী অনেকেই জানেন। তাই আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় অভয়া কাণ্ড ঢাকতে

> **জেসিকা লাল আর নির্ভয়া মামলায় সিবিআই সাফল্য পেয়েছিল সাত বছর পরে। অভয়া মামলাতেও তারা সাফল্য পাবে। তবে সীমা পাহুজাদের মানুষকে বোঝাতে হবে তারা পারবেই।**

মমতা যে কোনো রাজনৈতিক নিম্নরুচির খেলা খেলবেন না তা জোর দিয়ে বলা যায় না বলেই তাদের ধারণা। আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত চালাচ্ছে। সিবিআই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দপ্তরের অধীন। তাই তৈরি হয়েছে সেটিঙের আজগুবি ধারণা। তৈরি হয়েছে হতাশা। এই সাংঘাতিক রোগে অভয়ার পিতা-মাতাও আক্রান্ত। এখন এ রাজ্যে এক নতুন এক উচ্ছিষ্ট প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এরা মমতাপন্থী বামপন্থী। তারাই হয়তো অভয়ার মা-বাবার মগজ ধোলাই করেছে। গত ২৯ নভেম্বর আরাজি কর মেডিক্যাল কলেজে দুর্নীতির মামলায় সন্দীপ ঘোষ, আশিস পাণ্ডে, সুমন হাজরা, বিপ্লব সিংহ ও আফসার আলি খানের বিরুদ্ধে আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে সিবিআই আধিকারিকরা চার্জশিট জমা করেন। কিন্তু বিচারক বলেন— 'আদালতে চার্জশিট পেশ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই চার্জশিটটিকে অনুমোদন করতে হবে। এক্ষেত্রে এখনও অনুমোদন আসেনি। ঘোষ ও পাণ্ডে দু'জনেই সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক।'

মমতা প্রশাসনের অসহযোগিতায় অনুমোদন আদায়ে ব্যর্থ সিবিআই যদি নিজের ধারাবাহিক ব্যর্থতার দায় বহন করে নিয়ে যেতে থাকে তবে ইতিহাসের বিচারে তাতে যেমন কালিমালিপ্ত হবে, সিবিআই তেমনি দায়বদ্ধ থাকবে তাদের প্রভুরা আর 'ম্যানেজ মমতা'। তবে আমার ধারণা মমতা চলে গেলেও সিবিআই থেকে যাবে। সিবিআইকে মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক প্রভু নয় সঠিক তদন্তই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। জেসিকা লাল আর নির্ভয়া মামলায় তারা সাফল্য পেয়েছিল সাত বছর পরে। অভয়া মামলাতেও তারা সাফল্য পাবে। তবে সীমা পাহুজাদের মানুষকে বোঝাতে হবে তারা পারবেই। কেবল রাজ্যের মানুষকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। মুখোশের আড়ালে থাকা অপরাধীর মুখোশ খসে যাবেই। □

ফিরহাদ তো ছক ফাঁস করে দিল দিদি!

দিদি গো দিদি,

আপনার প্রিয় ববি এটা কী করল? কী কথা বলে দিল? আপনার মনের কথা, ইচ্ছা এভাবে বলে দিল? গোটা দেশ দেখছে বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাগুরু হওয়ায় কী অবস্থা সেখানে। গণতন্ত্রের গ নেই। পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সেখানকার হাল তো আপনি জানেনই। বেলডাঙ্গা থেকে মেটিয়াবুরুজ, ধুলাগড় থেকে পার্ক সার্কাস। এবার বলছে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগুরু বানাতে হবে। দিদি এটা তো আপনার মনের বাসনা! তাতে সঙ্গী ফিরহাদ, হুমায়ুন, সিদ্দিকুল্লারা। কিন্তু সেই কোর টিমের ভিতরের কথা এভাবে কেউ প্রকাশ্যে বলে দেয়? ফিরহাদকে আপনি সব চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। ওকে কলকাতার প্রথম মুসলমান মেয়র করেছেন। সঙ্গে গোটা রাজ্যে যাতে তাঁর হুকুম চলে এমন সব দপ্তর দিয়ে রেখেছেন। দলে ভাইপো না চাইলেও তাঁকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে রেখেছেন। আর সেই আদরের ববি কিনা আপনার গোপন বাসনা, গোপন লক্ষ্য ফাঁস করে দিল?

ফিরহাদ কী বলেছেন আপনাকে আর একবার মনে করিয়ে দিই। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও কলকাতার মহানাগরিক অতীতে 'মিনি পাকিস্তান' চিনিয়েছিলেন তাঁর বিধানসভা এলাকাকে। সেটাও আবার বিদেশি সংবাদমাধ্যমকে। আর এবার নিজের 'কওম' মানে মুসলমান কমিউনিটির জন্য তো বড়ো লক্ষ্য বলে দিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমি এমন একটি সম্প্রদায় থেকে, যে সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে তো ৩৩ শতাংশ, কিন্তু হিন্দুস্থানে মাত্র ১৭ শতাংশ, আমাদের সংখ্যালঘু বলা হয়। আমি নিজেকে সংখ্যালঘু ভাবি না। আমি মনে করি, যদি আল্লার আমাদের ওপর করুণা হয়, ...তাহলে আমরা একদিন সংখ্যাগুরু হতে পারব। আল্লা সহায় হলে আমরা এটা করেই ছাড়ব।' এখানেই থামেননি তিনি। বলেছেন, 'কিছু হলেই মোমবাতি মিছিল করা হয়। উই ওয়ান্ট জাস্টিস... উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আমি বলছি, মিছিল করে বিচার চেয়ে কিছু হবে না। নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাও যাতে বিচার চাইতে হবে না, তুমি নিজেই বিচার করবে।' ভাবা যায় দিদি! আপনার এত বড়ো গোপন বাসনা একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল!

ওইটুকু না কি! ফিরহাদ সাহেব বলেছেন, 'আমাদের উপরে যদি আল্লার রহমত থাকে, তালিম যদি আমাদের পক্ষে থাকে, তাহলে একদিন আমরা মেজরিটির থেকেও মেজরিটি হয়ে যেতে পারি। আমরা যদি নিজেদের শক্তি দিয়ে এটা অর্জন করতে পারি, তাহলে সেটা আল্লার কৃপা হবে।' আল্লার রহমত চাওয়াটুকুও মেনে নিতে পারা যায় কষ্ট করেও। কিন্তু তার পরে ওটা কী বললেন? হ্যাঁ দিদি ফিরহাদ বলেছেন, কলকাতা হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে দুই থেকে তিনজন বিচারপতি রয়েছে যাঁরা মুসলমান। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। আমাদের ওই জায়গায় পৌঁছতে দেওয়া হয়নি। আগামীদিনে কলকাতা হাইকোর্টে আমরা মুসলমানরাই সব থেকে বেশি বিচারপতি হিসেবে থাকব এবং বিচার করব। আল্লা যদি আমাদের সঙ্গে থাকে, তাহলে মেজরিটি হবার থেকে আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।' হাততালি দিদি হাততালি। আপনার প্রিয় ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এত হাততালি ফিরহাদের কওমের লোকেরা দিচ্ছিলেন যে অন্য কিছু শোনা যাচ্ছিল না। সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী তথা মেয়র যা বললেন তাতে মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি তিনি এমন দেশ চান যেখানে ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও শীঘ্রই মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে উঠবেন। হাকিম কি এমন একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন, যেখানে মুসলমানদের কোনও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বা মিছিলের উপরে নির্ভর করতে হবে না। বরং, নিজেদের হাতেই বিচার তুলে নিতে পারবেন? শরিয়ত আইনের ইঙ্গিত দিলেন কি ফিরহাদ?

> "দুধেল গাইদের একটুও রুষ্ট করতে চান না আপনি। দিদি, রাজ্য, দেশ থাকবে। ক্ষমতা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। তাই ফিরহাদের নিন্দা করে ক্ষমতাকে নড়বড়ে করবেন না প্লিজ।"

কত ভেবে আপনি একটা ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান মুখ হিসেবে ফিরহাদকে সামনে রেখে চলছিলেন দিদি। কিন্তু সেই ফিরহাদই কি না আপনার গোপন মনোবাসনা সোজাসাপটা বলে দিল? আপনি সমর্থন করেননি? কই, আপনাকে তো সেভাবে কোনও প্রতিবাদ করতে দেখলাম না। দলের থেকে মুখ বাঁচানো একটা বিবৃতি অবশ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি? কথায় কথায় তো ফেসবুক লাইভ করেন। আমি জানি দিদি, আপনি এটা বলবেন না। বলা উচিতও নয়। দুধেল গাইদের একটুও রুষ্ট করতে চান না আপনি। দিদি, রাজ্য, দেশ থাকবে। ক্ষমতা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। তাই ফিরহাদের নিন্দা করে ক্ষমতাকে নড়বড়ে করবেন না প্লিজ। আমিও চাই, আপনার উপরে আল্লাতালার রহমত থাকুক। □

অতিথি কলম

মধুভাই কুলকর্ণী

রাষ্ট্রভক্তির পুরোধাপুরুষ ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

স্বাধীন ভারতের সমাজে কোন কোন গুণ থাকা উচিত, রাষ্ট্রোত্থানের চিন্তা যদি কেউ করে থাকেন তা কেবলমাত্র ডাঃ হেডগেওয়ার। এখানেই স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে তাঁর অসাধারণত্ব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের সময়কাল ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার ছিলেন প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামী। যে কোনো বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড তা লোকমান্য তিলকের হোম রুল লিগের জন্য অর্থ সংগ্রহ, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, খাদির প্রচার, স্বদেশী ভাণ্ডার চালানো, স্বাতন্ত্র্য দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা— এমন সব ধরনের কাজে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ দেখা যেত। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে কার্য সমিতিকে পাঠানো প্রস্তাব থেকে স্বাধীনতার জন্য তাঁর হৃদয়ের লেলিহান অগ্নিশিখা অনুভব করা যায়। ভারতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদী শক্তির গ্রাস থেকে বিশ্বের দেশগুলিকে মুক্ত করা কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। এমন প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে গ্রহণ করা হোক তা ডাক্তারজীরও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেসময় আনুষ্ঠানিকভাবে তা ঘোষণা করা কংগ্রেসের পক্ষ সম্ভব ছিল না। ১৯২১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণার সময় আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তাতে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। আদালতে ডাঃ হেডগেওয়ার সরকারি উকিলকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাস্তবে এমন কোনো নিয়ম আছে কি যার শক্তিতে এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের ওপর শাসন করতে পারে? এই বিষয়টি প্রাকৃতিক ন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নয় কি? ভারতবাসীকে পদদলিত করে শাসন করার অধিকার ইংরেজদের কে দিয়েছে? যেভাবে ইংল্যান্ডের লোক ইংল্যান্ডের ওপর, জার্মানির লোক জার্মানির ওপর শাসন করে, তেমনই আমরা ভারতের লোক ভারতের মালিকরূপে নিজেদের শাসন চাই। আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই আর তা আমরা পাবই।'

স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চলা সব রকমের কার্যকলাপের মধ্যে সহভাগী হওয়ার সময় একটি মৌলিক প্রশ্ন তাঁকে সবসময় পীড়িত করত, আর তা স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে তাঁর মনে হতো।

'আমরা স্বাধীনতা হারালাম কেন? যে ভুলের জন্য আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি তেমনটা আবার যে হবে না, তার গ্যারান্টি কী?'

একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা যে কেউ অনুভব করতে পারবে, তা হলো বিশ্বাসঘাতকতা। সিন্ধের সম্রাট ছিলেন রাজা দাহির। মহাশক্তিধর শাসক রূপে তাঁর সর্বত্র খ্যাতি ছিল। তিনি মহম্মদ বিন কাসিমের আক্রমণে পরাজিত হন। তার কারণ তাঁর সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

দিল্লির সম্রাট বীর পৃথ্বীরাজ চৌহান আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরিকে কয়েকবার পরাজিত করেন। শেষে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন। তিনি হেরেছিলেন নাকি তাঁকে জেনেশুনে হারানো হয়েছিল? পৃথ্বীরাজের শ্বশুর জয়চাঁদ অন্তর্ঘাত করে পৃথ্বীরাজকে বন্দি করায়।

শত্রু তো লোভ দেখাবেই। তাকে আমি হত্যা করব আর তার জায়গায় তোমাকে সম্রাট বানাব। সম্রাট হওয়ার লোভ তীব্র হলেই কি শত্রুকেই আমরা আমাদের দেশে ডেকে আনতে পারি? এরকম ভাবনা জয়চাঁদের মনকে স্পর্শ করতেই পারেনি।

এমনটাই চলতে থাকলে স্বাধীনতা ধরে রাখা সম্ভব হবে কি? দেশভক্তি সামান্য কিছু লোকের মনে রয়েছে, এমনটা কেন?

প্রত্যেক নাগরিক স্বভাবেই দেশভক্ত হওয়া উচিত, প্রত্যেকের প্রাথমিক গুণ দেশভক্তিই হওয়া উচিত। স্বাধীনতার মতোই এই প্রশ্নটিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতার পরম্পরা বন্ধ উচিত।

আমরা পরাধীন কেন হলাম? এই প্রশ্ন কেশবের মনকে কতটা আলোড়িত করত, তা তাঁর কাকার সঙ্গে পত্রালাপ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাশ করে কেশব নাগপুর ফিরে আসেন। তাঁর আত্মীয়রা আলোচনা শুরু করে যে, কেশব এবার ডাক্তারি শুরু করবে এবং বিয়ে করে সংসারী হবে। তাঁর কাকা যাঁকে সকলে আবা বলে ডাকতেন, তিনি কেশবকে চিঠি লিখে এবিষয়ে জানতে চান। আবা চিঠিতে লেখেন, 'লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, বীর সাভারকর, ডাঃ মুঞ্জে এই মহান ব্যক্তিরা বিয়েও করেছেন এবং তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় রয়েছেন। তোমার চিন্তাভাবনা কী? চিঠির উত্তর থেকে কেশবের মনের মধ্যে চলা ঝড়ের আভাস পাওয়া যায়। কেশব লেখেন, 'চিঠিতে আপনি যা লিখেছেন তা সব সত্যি, কিন্তু আমার মনকে একটি প্রশ্ন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমাদের নিজেদের লোকেদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমরা পরাজিত হয়েছি এবং পরাধীন হয়ে গেছি। এটা কি বন্ধ সম্ভব নয়? এর জন্য যদি আমি কিছু করতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

আপনার কথা সত্য যে, বিয়ে করে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় থাকা যেতে পারে, কিন্তু আমার ভাবনা আলাদা। এটা বাড়ির জন্য আর এটা দেশের জন্য, দু'রকম চিন্তা আমি করতে পারব না। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হব না, এটা আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, অনুগ্রহ করে বিয়ের আলোচনা বন্ধ রাখুন।'

ডাঃ হেডগেওয়ারের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার যে স্ফুলিঙ্গ ছিল তার প্রকাশ বিভিন্ন সময়ে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে পাওয়া যেত।

১৮ মার্চ ১৯২২, গান্ধীজীর ৬ বছরের জন্য কারাদণ্ড হয়। তাঁর কারাবাস থেকে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের ১৮ তারিখকে 'গান্ধী দিবস' হিসেবে পালন করা হতো। এমনই এক গান্ধী দিবসে ডাক্তারজীর কথার মধ্যে প্রধান দুটো কথাই পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীজীর মতো পুণ্যবান পুরুষের সদ্‌গুণাবলী শ্রবণ ও চিন্তনের জন্য এই

দিন। গান্ধীজীর সদ্‌গুণগুলিকে আত্মস্থ করা অর্থাৎ করণীয় কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য নিজের স্বার্থকেও ত্যাগ করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি গান্ধীজীর অনুসারী হয়ে থাকেন তবে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে যুদ্ধের ময়দানে নামতে হবে। এই ধরনের চিন্তায় ডাক্তারজীর মন পরিপূর্ণ ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চলা সব ধরনের প্রচেষ্টায় সামনের সারিতে সক্রিয়ভাবে থাকার পাশাপাশি তাঁর মনোভূমিকা অনুধাবন করলে পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতার সৈনিকরূপে তাঁর আলাদা এক ছবি প্রস্ফুটিত হয়। তাঁর ভাবনা ছিল--

(১) সম্পূর্ণ প্রভাবী সংস্কার ছাড়া দেশভক্তির অটুট স্বরূপ নির্মাণ সম্ভব নয় এবং এমন স্বরূপ নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক আচরণে নিষ্ঠা আনা সম্ভব নয়।

(২) দেশভক্তিতে লীন এবং চরিত্রবান, গুণবান, সীমাহীন সেবা ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত জীবনযাপনের জন্য আগ্রহী, সক্রিয়, কর্তব্যনিষ্ঠ যুবক লক্ষাধিক সংখ্যায় নির্মাণ হওয়া প্রয়োজন।

(৩) সমাজের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু এই গভীর সমস্যার পরিসমাপ্তি করতে কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়তার দীক্ষা দিয়ে দেশহিতের জন্য জীবন সমর্পণকারী নাগরিক সমগ্র দেশে বড়ো সংখ্যায় নির্মাণ করতে হবে।

ডাঃ হেডগেওয়ারের মনে চলতে থাকা উপরোক্ত ভাবনা থেকে এটা মনে আসে যে, প্রাপ্ত স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার জন্য সমাজের প্রস্তুতি কেমন থাকা উচিত সে নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছিলেন।

প্রথমে স্বাধীনতা না সমাজ সংস্কার, এই বিতর্কও সেই সময় চলছিল। ডাক্তারজী সেই বিতর্কের মধ্যে যাননি। Eternal vigilance is the price of liberty — এরকম একটা ইংরেজি প্রবাদ খুব প্রচলিত রয়েছে। Eternal vigilance-এর জন্য প্রয়োজনীয় গুণযুক্ত সমাজ নির্মাণের জন্য কী করা উচিত, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা তিনি করেছিলেন।

শুধুমাত্র এটুকু ভেবেই তিনি থেমে থাকেননি, স্বাধীনতা আন্দোলনে সব ধরনের কার্যকলাপে তিনি উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে যুক্ত থেকেও তিনি আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কাজকর্ম থেকে দূরত্ব রেখে একটা অসাধারণ কাজ শুরু করেন। সেই কাজই বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয়তার দীক্ষা দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি না হয়ে রাষ্ট্রীয় ভাবনায় ভরপুর সমাজ নির্মাণ হোক, এমন ছিল ডাক্তারজীর ভাবনা। রাষ্ট্রীয়তার ভাবনার স্ফুরণ সমাজে হোক, এর জন্য কয়েক প্রজন্ম কাজ করে যেতে হবে এমনটা তিনি আন্তরিকভাবেই মনে করতেন। রাষ্ট্রীয়তার ভাবনায় ভরপুর, দেশহিতে সারাজীবন সদাজাগ্রত নাগরিক সমগ্র দেশে ব্যাপক সংখ্যায় এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকবে, এই লক্ষ্য চোখের সামনে রেখে তিনি এক ভিন্ন প্রকারের কাজ চালিয়ে যান, যার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরিচয় হলো দৈনিক এক ঘণ্টার শাখা। শাখা মানে দেশভক্তির সৎসঙ্গ। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দেশভক্তি একটি প্রধান গুণ হওয়াই উচিত। সমাজে অভিজ্ঞতাপুষ্ট সৎসঙ্গ, সদ্‌বিচার, সদাচারের এক নতুন অধ্যায় তিনি যুক্ত করেন। দেশভক্তির প্রভাবী সংস্কার দেওয়ার জন্য এমন সৎসঙ্গের আবশ্যকতা রয়েছে। সঙ্ঘের প্রত্যেক শাখা হলো দেশভক্তির সৎসঙ্গ। এটি ডাক্তারজীর মৌলিক চিন্তন।

সঙ্ঘের কোনো শাখাতেই কোনো দেব-দেবী বা মহাপুরুষের ছবি লাগানো হয় না, রাখাও হয় না। শাখার ছটি উৎসব এবং যদি কোনো মহাপুরুষের বিশেষ কোনো তিথি পালন করা হয় শুধুমাত্র সেই অনুষ্ঠানের জন্য ছবি লাগানো হয়। সঙ্ঘনির্মাতা ডাক্তারজীর ছবিও লাগানো হয় না। কোনো ব্যক্তির নামে জয়ধ্বনিও দেওয়া হয় না। শাখা মানে বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভক্তি।

আমি কী পাব? এর ওপর দেশভক্তি টিকে নেই। এখানে দর-দামের বিষয়ই থাকতে পারে না। এই প্রসঙ্গিক ভাবনা ড. আম্বেদকর সংবিধান সভাতে অন্তিম ভাষণে ব্যক্ত করেন— 'এখন আমরা বহুদলীয় গণতন্ত্র স্বীকার করছি। প্রতিটি দল ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করবে। দলহিত না রাষ্ট্রহিত এমন প্রশ্নের সম্মুখীন যখন যখন হবে তখন কি দলহিত রাষ্টহিতের উপরে থাকবে?'

প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের মনে থাকে,আমি প্রথমে ভারতীয়, মধ্যে ভারতীয়, শেষেও ভারতীয়। ভারতের জন্য বলিদান করার যদি সময় আসে তাহলে আমি প্রথম সারিতে থাকব। ভারতের একতার ওপর কোনো আঘাত সহ্য করা যাবে না।

আপনি মার্ক্সবাদী হন, লোহিয়াবাদী হন, গান্ধীবাদী হন, আম্বেদকরবাদী হন আর যা কিছুই হন, কিন্তু রাষ্ট্রবাদী হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। নেশন ফার্স্টের ভূমিকা প্রত্যেক ভারতীয়ের থাকা উচিত, এমন প্রচেষ্টা সঙ্ঘের রয়েছে।

আজ ৮০ হাজারেরও বেশি দেশভক্তির সৎসঙ্গ অর্থাৎ শাখা চালু রয়েছে। দ্রুত এই সংখ্যা ১ লক্ষ হোক তার প্রচেষ্টা চলছে। এমন সৎসঙ্গ প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক বসতিতে করতে হবে, এমন যোজনা সঙ্ঘের রয়েছে। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক প্রতিটি রাজ্যে ভ্রমণ করেন। কার্যকর্তাদের বৈঠক নেন, বৈঠকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন— সমস্ত মণ্ডলে, সমস্ত বসতিতে শাখার কী পরিকল্পনা রয়েছে?

স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য সত্যাগ্রহ, কারাবাস এসবের সঙ্গে প্রয়োজন হলেও প্রাণবলি দেওয়ারও তৎপরতা ছিল। স্বাধীন ভারতের সমাজে কোন কোন গুণ থাকা উচিত, রাষ্ট্রোত্থানের চিন্তা যদি কেউ করে থাকেন তা কেবলমাত্র ডাঃ হেডগেওয়ার। এখানেই স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে তাঁর অসাধারণত্ব। দেশের জন্য বাঁচতে শেখার মানসিকতা সম্পন্ন নাগরিক প্রয়োজন। দৈনন্দিন আচরণে দেশভক্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করা, অনুশাসন পালন করা, নিষ্ঠাপূর্ণ ব্যবহার করা, পরিবেশের অনুকূল জীবনশৈলী এবং ভেদভাবরহিত স্বাভিমানসম্পন্ন নাগরিক প্রয়োজন। সঙ্ঘকাজ ঈশ্বরীয় কাজ, এমনটা ডাঃ হেডগেওয়ার সবসময় বলতেন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সমিতির সদস্য)

With Best Compliments
From -

Bhaskar Bhattacharya

Advocate

বাংলাদেশের পরিস্থিতির সুযোগে পাকিস্তানে চিকিৎসা-নগরীর পরিকল্পনা চীনের

বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি, হিন্দুদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ। সেদেশে ভারত-বিদ্বেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ নিতে ছাড়ছে না চীন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকরা ভারতের ওপর যে বিষয়টির প্রতি সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল, সেটি হলো চিকিৎসাক্ষেত্র।

গত ১২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে বৈঠকের সময় চীনের বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি দল করাচির ধবেজি অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি চিকিৎসা-নগরী গড়ে তুলতে ন্যূনতম এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনার রূপরেখা পেশ করেছে। সূত্রের খবর, এই চিকিৎসা-নগরী বা মেডিক্যাল সিটি হবে পাকিস্তানের প্রথম সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত ফার্মাসিউটিক্যাল এবং মেডিক্যাল ইকোসিস্টেম। ধবেজি অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা কোরাঙ্গি অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (কেএটিআই) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, চীনা বিনয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দুই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের উদাহরণ।

এমনিতে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছেই। দু'দেশেরই প্রধান লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতকে আটকানো। যার ফলে চীনের একাধিক প্রকল্প পাকিস্তানে রয়েছে, যার মধ্যে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের মতো প্রকল্পও আছে। এটিকে পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য 'লাইফলাইন' বলা হয়। মেডিক্যাল সিটির প্রস্তাবের ফলে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক যেমন আরও বাড়ার সম্ভাবনা, তেমনই পাকিস্তানের অর্থনীতিকেও কিছুটা অক্সিজেন জোগাবে বলে মনে করছে আন্তর্জাতিক মহল।

সূত্রের খবর, পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সংকট চরমে। এই অবস্থায় চীনা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল পাকিস্তানে একটি মেডিক্যাল সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়, এই মেডিক্যাল সিটি তৈরি করার জন্য অন্তত এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীনা দল। তাদের তরফে একটি প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারির সঙ্গে দেখা করে মেডিক্যাল সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চাইছে। আর তারপরই সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে যে পরিবর্ত পরিস্থিতিতে কি বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে সেই পরিকল্পনা করছে চীন? এমনিতে বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন। তাদেরকে অন্তত চিকিৎসার জন্য পাকিস্তান-মুখী করবার জন্য চীনের এই পরিকল্পিত চাল নয়তো?

এই আশঙ্কা সত্য করে বাংলাদেশের 'প্রথম আলো' সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ঢাকায় থাকা পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ দুই সহকর্মী নিয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে সম্প্রতি সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য আসেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ও পাকিস্তানের হাইকমিশনার দুই দেশের স্বাস্থ্য ও বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় পাকিস্তানের হাই কমিশনার বলেন, বাংলাদেশের ওষুধশিল্প অনেক ভালো অবস্থানে আছে। পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানি করতে আগ্রহী। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশ নাকি ওষুধশিল্পে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রায় ৯৫ শতাংশ বাংলাদেশেই তৈরি হয়। এমনকী বাংলাদেশ শতাধিক দেশে ওষুধ রপ্তানি করে বলেও ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মুরাদ আলি শাহ এবং চীনা কনসাল জেনারেলও পাক-প্রশাসনের সঙ্গে চীনা বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১২ তারিখের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রাষ্ট্রপতি জারদারি পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে 'গভীর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্ব' তুলে ধরেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যে চীনা প্রতিনিধিদল শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতে নয়, কৃষি, পশুসম্পদ, জ্বালানি, পরিবহণ এবং উৎপাদন-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও আগ্রহ দেখিয়েছে।

পাক-রাষ্ট্রপতি জারদারি বিবৃতিতে বলেছেন, 'সরকার পাকিস্তানে চীনা বিনিয়োগের সুবিধার্থে সবরকমের সহযোগিতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা চীনা বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানাই এবং তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী বিনিয়োগকারীদের বলেছেন, যে সরকার ভাষাগত বাধা দূর করতে এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বাড়াতে প্রদেশে চীনা ভাষার কোর্স ইতিমধ্যেই চালু করেছে। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, পাকিস্তানের এই বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও চীনের এই আর্থিক বিনিয়োগ অর্থনৈতিক খাতিরে নয়, বরং কূটনৈতিক তাগিদে। যার একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশের এই উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতকে বিব্রত করা। সুতরাং ভারতকেও এর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ▯

পাকিস্তানের এই বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও চীনের এই আর্থিক বিনিয়োগ অর্থনৈতিক খাতিরে নয়, বরং কূটনৈতিক তাগিদে। যার একমাত্র লক্ষ্য বাংলাদেশের এই উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারতকে বিব্রত করা।

ইসলামি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মনে আগুন জ্বলছে

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ধারাবাহিক হামলা ও অত্যাচারের সব সীমা অতিক্রম করেছে সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তার ও জেল বন্দির ঘটনায়। জাতীয় পতাকার অবমাননার মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তারের গাজোয়ারি শুধু অন্যায় নয়, নগ্নভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ এই দেশটার সংখ্যাগুরু নাগরিক মুসলমানরা মনে করেন তাঁরা আগে মুসলমান পরে বাংলাদেশি, আগে মজহব পরে দেশ। জাতীয় পতাকার উপর বসে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ আদায়, দেশের পতাকা পাতিয়ে তাতে মজহবি মেহফিলের খানাপিনার জমজমাট আসর বাংলাদেশের এক পরিচিত দৃশ্য। হিন্দুদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ও সমাবেশে গেরুয়া পতাকা রাখায় জাতীয় পতাকা অবমাননার বিএনপির অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা এখন প্রমাণিত। আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যার মিথ্যা অভিযোগ এনে দেশের সেনা ও পুলিশ প্রসাসনকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলেছে ব্যাপক ধরপাকড়, পুলিশি সন্ত্রাস, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, গ্রেপ্তার।

বাংলাদেশে ইসকন সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করার ষড়যন্ত্র ও চিন্ময় প্রভুর অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আন্দোলনের পরেই স্বাধীন বাংলাদেশে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' হয়ে থাকা সংখ্যালঘুরা তাঁদের পরিবার, পরিজন, বাড়ির উঠোন, ঘরের মা-বোন,, তুলসীতলা, দুর্গামণ্ডপ, কালীবাড়ি আগলে চরম আতঙ্কে রাত জাগছে। প্রতিদিন ভাঙচুর হচ্ছে হিন্দুর ঘরবাড়ি। আগুন জ্বলছে হিন্দুপাড়ায়, ভেঙে দেওয়া হয়েছে মন্দির। আগেই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে বাংলাদেশের গর্বের জাতীয় সংগ্রহশালা। সাড়ম্বরে ইফতার পার্টি দেওয়া ইসকন, সেই রোজা পালনকারীদের হাতেই মৃত্যুর প্রহর গুনছে আজ। আগেই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্য। যাদের নেতৃত্বে ও আশকারায় আজ বাংলাদেশ জতুগৃহ তৈরি হয়েছে, তাদের অগ্রমুখ 'আন্দোলনকারী ছাত্র'দের লুট করা হাঁস, মাছ, ছাগল, চেয়ার, টেবিল, ফুলের টব, ব্লাউজ, মেয়েদের অন্তর্বাস নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে অভূতপূর্ব উল্লাস অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে গোটা বিশ্ব।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কীভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে দিচ্ছে দিন দিন, সেটা বুঝে রাখাটা জরুরি। আওয়ামি লিগ সরকারের বিরুদ্ধে 'কোটা বিরোধী' আপাত 'ছাত্র আন্দোলন' কেন একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী আন্দোলন হয়ে উঠলো? স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি যারা ভাঙলো, তারা কারা? একটা আলাদা দেশের ছাত্র আন্দোলন কী করে এবং কেন ভারত বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো? কাদের মদতে একটি আপাত ছাত্র আন্দোলন প্রতিবেশী দেশ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো? দুশ্চিন্তা সেখানেই। মজহবি উন্মাদনাকে একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করা এবং হিন্দুশূন্য বাংলাদেশের অ্যাজেন্ডাকে সফল করা বাংলাদেশের শাসক ও মোল্লাবাদীদের দীর্ঘদিনের এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। যাদের এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, এই ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন হবেন নিশ্চিত।

না, কোনো অর্থে দাঙ্গা নয়, এটি বরং একতরফা হিংসা ও আক্রমণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে একেবারে নিজেদের কবজায় রাখার জন্য প্রায় চোদ্দ বছর ধরে নিষিদ্ধ থাকা জামাতে ইসলামিকে নতুন করে সক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। জেল থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে হত্যা-ধর্ষণ-সন্ত্রাসে অভিযুক্ত জেলবন্দি অপরাধীদের। রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার উন্মাদ ইসলামিক ফতোয়ার এই জামাতে ইসলামি, বোকা জনগণের উচ্চকিত কণ্ঠে 'আমার সোনার বাঙ্গলা' সুরের পেছনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ শূন্য, সংগীতহীন, শিল্পহীন, ভাস্কর্যহীন ইসলামিক দেশ তৈরির ঘুঁটি সাজিয়েছে। হিন্দু নরহত্যার এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে, কিছু জায়গায় 'সম্প্রীতির নিদর্শন' রেখে কেউ কেউ নাকি পাহারা দিচ্ছিলেন মন্দির, বৌদ্ধমঠ।

অথচ আজ যাদের বাড়িঘর লুট হচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ির দালান, ধর্ষিত হচ্ছেন বাড়ির মা-বোন, তারাও বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা'র আন্দোলনের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে গেয়েছেন দেশের জাতীয় সংগীত, জেলে গেছেন, পুলিশের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন, রক্ত ঢেলে দিয়েছেন 'জেহাদি নিপীড়নহীন' এক স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায়। ঠিক যেমন ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেরই পূর্বপুরুষদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। অথচ ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে স্বাধীন দেশে এদেরই লুঠ হয়েছে অংসখ্য বাড়ি, ধর্ষিত হয়েছেন অগণিত নারী। ৫ কোটির বেশি হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে, বাপ-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে প্রাণভয়ে পরদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আজও ঠিক তেমনি ধর্ম ও প্রাণ বাঁচানোর কঠিন ও নির্মম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের কয়েক কোটি সংখ্যালঘু হিন্দু। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর একতরফা এই আক্রমণ-হত্যা- ধর্ষণের একটি বিস্তৃত ও পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু হত্যা ও সনাতনী আন্দোলনের অগ্রমুখ প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ মহারাজের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কোনো মুসলমান বিদ্বেষ নয়। বরং ইসলামিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে যে চাপা আগুন সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভিতর ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে তাকে প্রতিহত করার একমাত্র প্রক্রিয়া।

১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবরের কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে নোয়াখালিতে হিন্দু শূন্য পূর্ববঙ্গ তৈরির উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু গৃহহীন ও ভিটেহীন হয়েছিলেন। দাঙ্গার বীভৎসতা এমনই ছিল, গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রাকালে কৃপালনী স্বয়ং ধর্ষিত হতে পারেন এই আশঙ্কায়

ফঃ ২

পটাশিয়াম সায়ানাইডের ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। ১৯৪৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পাকিস্তানিদের হাতে ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেট, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও যশোরে ৫ লক্ষ হিন্দু হয়, দেশ ছাড়া হয় তারও কয়েক গুণ (প্রায় ৪৫ লক্ষ)। ১৯৪৬ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের সংরক্ষিত চুল চুরি হয়েছে এই অজুহাতে বাঙ্গালি হিন্দুদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার নারকীয় হত্যালীলা চলে বাংলাদেশ জুড়ে। ঐতিহাসিক ১৯৭১। সময়কাল ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর। পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস ও জামাতে ইসলামির টার্গেট ছিল মূলত বাঙ্গালি হিন্দু। হত্যা হয়েছিল ৩ লক্ষ বাঙ্গালি, ধর্ষিত হয়েছিল ৪ লক্ষ নারী এবং উদ্‌বাস্তু হয়েছিলেন ৩ কোটি হিন্দু। ২০০১ থেকে ২০০৬-এর খালেদা জিয়া সরকারের শাসন এবং পরবর্তীকালে আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বারবার টার্গেট হয়েছে হিন্দুরা। জমি দখল, হত্যা, ধর্মান্তরণ প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশকে 'হিন্দু শূন্য' করার এই লক্ষ্য নিয়ে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে হিন্দুদের আক্রমণ করেছে, হত্যা-সন্ত্রাস চালিয়েছে তারাও একটি মজহবি আদর্শে অনুপ্রাণিত— তারা মজহবি কর্তব্য সম্পাদন করছে এবং পুরস্কার হিসেবে তারা জান্নাতে যাবে এবং 'হুর' উপভোগ করা সুযোগ পাবে। তেমনি ভাবে আপাতত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী বামপন্থী, যারা চুপ থেকে পরোক্ষভাবে এই হিংসাকাণ্ডে সমর্থন দিচ্ছে তারাও একটি মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। তারা মনে করেন, 'এ বিশ্বে সব লড়াই অর্থনৈতিক লড়াই, শাসকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াই।' এ কেবল মিথ্যাচার নয়, বরং ক্ষমতায় টিকে থাকা কিংবা ক্ষমতা লিপ্সার নৃশংস অস্ত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারাকাত তাঁর 'দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব রিফর্মিং এগ্রিকালচার : ল্যান্ড ওয়াটার বডিজ্ ইন বাংলাদেশ' (২০১৬) বইয়ে সাবধানবাণী দিয়েছেন অনেক আগেই— '৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে আর কোনো হিন্দু অবশিষ্ট থাকবে না... গত ৪৯ বছর সেই দিক নির্দেশ করে।' সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গতিপ্রকৃতি সেই আশঙ্কাকেই আরও দৃঢ় করেছে। অধ্যাপক বারাকাত পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে প্রায় ১ কোটি ১ লক্ষ ৩ মিলিয়ন হিন্দু বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট ভেকধারী ধর্মনিরপেক্ষ মুখোশধারীরা নিশ্চুপ।

ধান্দাবাজ ক্ষমতালোভী, মানবতা বিরোধী আপাত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার সময় নয় এখন। নয় একটা স্বাধীন দেশের তদারকি সরকারের প্রধানের রাজধর্ম পালনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে চুপ করে বসে থাকার। সময় এটা নয় নিরপেক্ষতার নামে নিজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার। নয় এটা প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে নপুংসকদের তালিকায় নাম লেখাবার। বরং আরও বেশি করে দায়িত্ব নেওয়ার সময় এটা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের। কারণ প্রতিবেশীর এই হিংসার আঁচ তার ঘরে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না। দুই প্রতিবেশী যে একই ভাষায় কথা বলে, গান গায়। স্লোগানের সুরও বাঁধে একই ভাষায়।

এরপরও একদল আপাত শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী পরোক্ষভাবে এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডে নির্লজ্জ মদত জোগাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার গোল গোল বুলি আউড়ে বীভৎসতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। নাস্তিকতার দিশাহীন ও বিভ্রান্তিকর প্রচার করে বরাবরের মতো ফায়দা নেওয়ার মতলব করছে। আবার কেউ কেউ তো বিষয়টাকে লঘু করার জন্য নিজের দেশ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ভূমিকাকে ছোটো করে দেখানোর প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন। এরাই প্রকৃত পরিস্থিতি ভুলিয়ে, আরও অসংখ্য দাঙ্গার সম্ভাবনা ও সম্প্রীতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ তৈরির বিকৃত মানসিকতার প্রধান নেতা। কারণ ভারতবর্ষ গণতান্ত্র ও পরমসহিষ্ণুতার যে উজ্জ্বলতম পরম্পরা বহন করে এসেছে তা এদের অজানা নয়, অজানা নয় যে দেশভাগ কেবল ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে। ভুলিয়ে দিতে চাইছে, এই সকল খুন-হত্যা-ধর্ষণ- উদ্‌বাস্তু হওয়ার একমাত্র কারণ যে ইসলামি আগ্রাসন। আজ বরং সেই ইতিহাস খুঁজে দেখা দরকার, কেন দেশভাগের পর যত ভাগ মানুষ পশ্চিম পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তার একশো ভাগের এক ভাগও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওই দেশে ফিরে যায়নি। কেন শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস চর্চায় পরিকল্পিতভাবে দেশভাগের প্রকৃত ইতিহাস চেপে যাওয়া হয়েছে? বাংলা সাহিত্যে সুনীল-শীর্ষেন্দু-সমরেশ কিংবা ঋত্বিক ঘটকরা উদ্‌বাস্তু যন্ত্রণা যতটা দেখিয়েছেন, তার এক খণ্ড প্রচেষ্টাও দেশভাগের প্রকৃত কারণে পৌঁছানোয় করেননি।

ধর্মকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা নেতাদের চোখে চোখ রেখে এখনই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, কেন ১৯৪১ সালের অধুনা বাংলাদেশের ২৮ শতাংশ হিন্দু কমতে কমতে ২০২৪-এ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭.২ শতাংশে? কেন স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় ৫ কোটি হিন্দু বিতাড়িত নিজের জন্মস্থান, নিজের দেশ থেকে— কেবলমাত্র জেহাদি হিংসার কারণে? কেন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ সালে ১৯ শতাংশ মুসলমান আজ বাড়তে বাড়তে আজ ৩৫ শতাংশে? বোঝা যাবে কেন মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত ও কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষিত হয়ে পালিয়ে আসা পূর্ববঙ্গীয় কমিউনিস্ট নেতারা বর্বরোচিত সন্ত্রাস-ধর্ষণের একটাও প্রতিবাদ করেননি কোনোদিন। বরং ইসলাম আগ্রাসন ও খুনের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া তসলিমা নাসরিনকে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশ যখন বিতাড়িত করেছে, তখন তাঁর প্রিয় শহর কলকাতায় সামান্য আশ্রয়টুকুও দেয়নি ক্ষমতাসীন 'ধর্মনিরপেক্ষ' বামফ্রন্ট। বোঝা যাবে কেন, এই নারকীয় হত্যায় অভিযুক্ত এযাবৎ একজন মুসলমানকেও শাস্তি দেয়নি বাংলাদেশ প্রশাসন। বরং হাজার হাজার সেইসব মানুষের 'শাস্তি' হয়েছে যারা হিন্দু আক্রমণের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন, কলম ধরেছেন, গান গেয়েছেন। দেশছাড়া হয়েছেন শাহরিয়ার কবীর, পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হয়েছে 'ভাঙা মঠ' উপন্যাসের লেখক সালাম আজাদের। খুন হয়েছেন ফয়জাল আরেফিন দীপন, বিজ্ঞানী অভিজিৎ রায়, ওয়াসিকুর রহমানবাবু, অনন্ত বিজয় দাস, নীলাদ্রি নীল-সহ কতশত কবি-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী।

বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দু হত্যা ও সনাতনী আন্দোলনের অগ্রমুখ প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ মহারাজের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ কোনো মুসলমান বিদ্বেষ নয়। বরং ইসলামিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে যে চাপা আগুন সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভিতর ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে তাকে প্রতিহত করার একমাত্র প্রক্রিয়া। এই প্রতিবাদ মানে ধর্মীয় মেরুকরণ নয়, বরং ভারতে ধর্মীয় মেরুকরণের সম্ভাবনাকে নাস্যাৎ করার একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ। আর বিশ্বে হিন্দুর একজোট হওয়ার আহ্বান প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রংপুর, ঢাকা প্রভৃতি এলাকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জনআন্দোলন সেই বার্তাই দিচ্ছে।

ভারতবাসীর কাছে এক পরম শ্রদ্ধার দিন পঁচিশ ডিসেম্বর

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৮৮৬ সালের ১৬ আগস্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহত্যাগ করলেন। স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার আঁটপুর। বাবুরামের মা মাতঙ্গিনীদেবী বাবুরামের গুরুভাইদের সেখানে আমন্ত্রণ জানালেন। নরেন্দ্রনাথ ও তার আটজন গুরুভাই ডিসেম্বর মাসে আঁটপুর গেলেন।

২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬, শুক্রবার সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নীচে নরেন্দ্রনাথ ও তার গুরুভাইরা ধুনি জ্বালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে অনেক আলোচনা করলেন। তারপর সকলে মিলে বসলেন ধ্যানে। ধ্যান শেষে শুরু হলো ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আলোচনা। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ যিশুখ্রিস্টের জীবন কথা এবং তার শিষ্যদের ত্যাগ, কঠোর শ্রম ও আত্মত্যাগের কথা বলতে শুরু করলেন। নরেন্দ্রনাথের বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে গুরুভাইয়েরা উঠে দাঁড়িয়ে ধুনির সেই আগুনকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলেন তারা আজ থেকে সমাজের কাজে ঘর বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। অলিখিতভাবে আঁটপুরের মাটিতে শুরু হয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপন। ভারতের সনাতন সংস্কৃতির ধারক বাহক প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্যরা। নরেন্দ্রনাথ পরিবর্তিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দে।

প্রশ্ন হলো, স্বামীজী সন্ন্যাস গ্রহণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের জন্য এই সময়টিকে বেছে নিলেন কেন? তাঁর মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কেন ২৪/২৫ ডিসেম্বরের মতো একটি খ্রিস্টীয় উৎসবের দিনকে সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হিসেবে স্বীকার করলেন? এর পিছনে কী কোনো সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল? আসলে যে সময় তাঁরা মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন সে সময় এদেশে ছিল খ্রিস্টমতের পালক পোষক ব্রিটিশ শাসন। ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের ২৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি

এই সময়টি হলো খ্রিস্টান ফেস্টিভ্যাল আর কার্নিভালের সপ্তাহ। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় সে যুগে কলকাতা-সহ সারা দেশে চলত খ্রিস্টীয় উৎসব পালনের ধুম। প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি সপ্তাহ ব্যাপী খ্রিস্টীয় উৎসবের জাঁকজমকে খ্রিস্টমাসটি সান্তাক্লজ, ক্যান্ডেল, কেক পেস্ট্রির আতিশয্যে বাঙ্গালি সমাজ প্রভাবিত হচ্ছিল। তারা বিদেশি সংস্কৃতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সনাতনী সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছিল।

একদিকে ডিরোজিও প্রবর্তিত ইয়ংবেঙ্গলের প্রভাবে বঙ্গের যুব সমাজ নিজ ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ হচ্ছিল, অন্যদিকে ইংরেজদের প্রভাবে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীর দল বিজাতীয় খ্রিস্টমত এবং তাদের উৎসবের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এমনকী ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাও খ্রিস্টমত গ্রহণ করে নিজেদের প্রগতিশীল ও এলিট বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করছিলেন। খ্রিস্ট মতের প্রতি যুবসমাজের এই আকর্ষণ এবং খ্রিস্টীয় উৎসবের প্রতি যুবসমাজের এই ঝোঁক স্বামীজী অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ'— গীতার এই শিক্ষা যদি বাঙ্গালিকে দিতে হয় তবে খ্রিস্টীয় উৎসবের বিরোধিতা নয়, বরং উৎসবের মেজাজটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে বাঙ্গালি সমাজকে সনাতন সংস্কৃতির দিকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সম্ভবত এই ভাবনা নিয়ে ২৪ ডিসেম্বরের দিনে তাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণ ও মিশন

প্রতিষ্ঠা।

ঠিক একইভাবে ১৮৮৬ সালের খ্রিস্টীয় উইন্টার ফেস্টিভেলের শেষ দিন, ১ জানুয়ারির সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাট্যকার গিরীশ ঘোষের উদ্যানবাটীতে কল্পতরু হয়েছিলেন। গিরীশ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার কী মনে হয়? আমি কে?' উত্তরে গিরীশ বলেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস আপনি রামকৃষ্ণ পরমহংস, মানব কল্যাণের জন্য মর্তে অবতীর্ণ, ঈশ্বরের অবতার, রামকৃষ্ণ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমি আর কী বলব, তোমাদের চৈতন্য হোক।' তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের স্পর্শ করেছিলেন। সকলে অনুভব করেছিলেন এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ঠিক যেমন করে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে ছুঁয়ে তাঁকে দিব্যরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও এই খ্রিস্টীয় উৎসবের দিনটিকে কল্পতরু হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। কেন? মহাপুরুষ অবতারেরা কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁদের কর্মকাণ্ডের অবতারণা করেন? না, করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও করেননি। তিনি এই দিনটিকে এই কারণেই বেছে নিয়েছিলেন যাতে বাঙ্গালি যুবপ্রজন্ম খ্রিস্টীয় উৎসব থেকে ধীরে ধীরে সনাতনী ভাবধারার দিকে পরিচালিত হয়। খ্রিস্টীয় উৎসবের বিরোধিতা করে নয়, বরং খ্রিস্টীয় উৎসবের দিকে ঝোঁকা বাঙ্গালিকে, খ্রিস্টীয় উৎসব মুখর আনন্দানুভূতিকে এক রেখে, খ্রিস্টীয় পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে উৎসবের অভিমুখ সনাতনের দিকে পরিবর্তিত করা।

এখানেই শেষ নয়। ২৫ ডিসেম্বরের আরও মহত্ত্ব আছে। স্বামীজী ভারতবর্ষকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতে ১৮৯০ থেকে ১৮৯২ তিন বছর ধরে দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পরিব্রাজক রূপে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ১৮৯২ সালের সেই ২৪ ডিসেম্বরের দিনে কুমির ও হাঙর সঙ্কুল অশান্ত হিন্দুমহাসাগর সাঁতরে উঠেছিলেন ভারতের শেষ শিলাখণ্ড কন্যাকুমারীতে ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর— তিনদিন তিনরাত মগ্ন রইলেন ভারতবর্ষের সাধনায়। ২৭ ডিসেম্বর ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন ভারতের অতীত গৌরব, বর্তমানের দুর্দশা ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর রূপ। বললেন, 'আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনসম্পন্না এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিতা হইয়া তাঁহার রত্নসিংহাসনে বসিয়াছেন, বিশ্বকে বরাভয় দান করিতেছেন। জগতে সেই বাণী প্রচার কর। ...এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।' এখানেও স্বামীজী তাঁর স্বদেশ আরাধনা শুরুর দিন হিসেবে বেছে নিলেন সেই ২৫ ডিসেম্বরকে। আর তাঁর সিদ্ধিলাভের দিন হলো ২৭ ডিসেম্বর, অর্থাৎ সেই খ্রিস্টীয় উইন্টার ফেস্টিভ্যালের কাল। তিনি নির্দেশ দিলেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউতে ভেসে যাওয়া নয়, স্বদেশী সনাতনের স্নেহগঙ্গায় স্নাত হতে হবে জাতিকে, ফিরতে হবে শেকড়ে। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'— জাতিকে এ তার দিশা নির্দেশ।

আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে ২৫ ডিসেম্বরের। একটি হলো এদিন তুলসী পূজন দিবস। এদিন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিপুষ্ট কাগজ আর প্লাস্টিকে তৈরি 'খ্রিস্টমাস ট্রি' দিয়ে ঘর সাজানোর দিন নয়। এ হলো পরিবেশকে নিরন্তর পরিশুদ্ধ করার মতো শত রোগ নিরাময়কারী সজীব তুলসীগাছ পূজনের দিন। পরিবেশ দূষণের বিষবাষ্পে সমগ্র বিশ্ব যখন অসহায়, তখন টেবিলে সাজানো প্লাস্টিকের তৈরি গাছ নয়, কল্পনার সান্তাক্লজ নয়, তুলসীর সঙ্গে রক্তমাংসযুক্ত প্রাণীকুলের জীব ও জীবনের অপার সম্পর্ক স্মরণ ও মননের দিন, জীবনদায়ী বৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন।

আর দ্বিতীয়টি হলো ২৫ ডিসেম্বর ভারতমায়ের সুসন্তান দেশবরেণ্য অটলবিহারী বাজপেয়ীজীরও শুভ জন্মদিন, যিনি দেশে সুশাসনের প্রবর্তন করেছিলেন।

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টমতাবলম্বীদের কাছে অবশ্যই মহত্ত্বের। ওইদিন নাকি তাদের ঈশ্বরপুত্র যিশুখ্রিস্ট জন্মেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালির কাছে, ভারতবর্ষীয়দের কাছে, সর্বোপরি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অন্য আঙ্গিকে শ্রদ্ধার। এইদিনেই স্বামীজীদের সন্ন্যাস গ্রহণ, এইদিনেই স্বামীজীর ভারত সাধনা, এদিনেই তুলসী পূজন। সব মিলিয়ে ২৫ ডিসেম্বর বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর কাছে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ দিন। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

ধুনি জ্বেলে ত্যাগব্রতের সংকল্প

কল্যাণ চক্রবর্তী

১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ রচনার পথকে সুগম করে দিয়েছিল। দিনটি একটি খ্রিস্টীয় দিবস (ক্রিসমাস ইভ), অথচ তাতে পুরোদস্তুর হিন্দুয়ানা।

দিনটি 'ধুনি দিবস', 'ত্যাগব্রত দিবস' বা 'সংকল্প দিবস' রূপে চিহ্নিত। ধুনি জ্বালিয়ে ঈশ্বরোপসেনা করেছিলেন কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ, তাই ধুনি দিবস। গৃহত্যাগের সংকল্প নিয়ে তাঁরা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাধনা শুরু করলেন, তাই ত্যাগব্রত দিবস। সংকল্প ছিল, সাধনজীবনের অঙ্গ হিসেবে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করার আদর্শ। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ', নিজের মোক্ষ লাভের জন্যই জগতের জন্য সেবার কাজ, সেইজন্যই সংকল্প দিবস। দিনটি পালিত হলো হুগলি জেলার আঁটপুর গ্রামে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়ি।

এখন প্রশ্ন, অন্য দিনও তো ছিল! কই তাঁরা বাছলেন না তো সেই সব দিন! হুগলির আঁটপুরেরও তাঁরা পৌঁছে গিয়েছিলেন আগেই। কেন আগেই এমন দিন খোঁজ করলেন না! ২৪ ডিসেম্বর আজ যত না খ্রিস্টীয় দিন, তার চাইতেও হিন্দুয়ানির পরত বেশি। কয়েকজন গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে একটি খ্রিস্টীয় দিবসকে এককথায় অতিক্রম করে গেলেন স্বামীজী।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দজী লিখছেন, '...বড়দিনের সময় যুবকভক্তদের অনেকেই আঁটপুরে বাবুরামের বাটিতে গমন করেন। সেখানে বৃক্ষমূলে ধুনি জ্বালাইয়া সদালোচনা চলিত। এক রাত্রে ভাববিহ্বল নরেন্দ্র উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী জীবনের তপশ্চর্যা, আত্মনিবেদন, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিলেন যে, তদ্ভাবে ভাবিত যুবকগণ তখনই সংকল্প করিলেন, তাঁহাদের ভাবী জীবন ওই আদর্শেই পরিচালিত হইবে। এই দিব্যভাবের আবেশ কাটিয়া গেলে তাঁহারা সবিস্ময়ে জানিতে পারিলেন যে, উহা ঈশার আবির্ভাবের প্রাকসন্ধ্যা।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যাবার পূর্বে কাশীপুর ছিল রামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনের ভরকেন্দ্র। ঠাকুরের উপস্থিতিতে ষোলো-সতেরো জন তাপসকে নিয়ে রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা হয়েছিল কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। এখানে ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তিনি 'কল্পতরু' হন। কাশীপুর মঠেই গুরুভ্রাতাদের প্রতীতি জন্মায়, সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের 'শক্তি', তিনি জীবন-মিশনের সঙ্ঘজননী। কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য সংসারত্যাগ করে আসা যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন নরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে হাতে লিখে দিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘরে বাইরে হাঁক দিবে।' কাশীপুর বাগানবাড়িতেই নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি-সুখ আস্বাদন করেছিলেন ঠাকুরের আশীর্বাদে।

ঠাকুরের শরীর যাবার পর বরানগরের পোড়ো বাড়িতে ১৮৮৬ সালের ১৯ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মঠের কাজ শুরু হয়। সেই বছরই অনুষ্ঠিত হয় ধুনি দিবস। এখানে সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়েছিলেন নয়জন গুরুভাই। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আঁটপুর এলেন নরেন্দ্রনাথ, তারক, শরৎ, শশী এবং কালী। মঠজীবনে বরানগরে ছিল এই সন্ন্যাসী শিষ্যদের কঠোর তপশ্চর্যার ক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে চিরজীবনের জন্য তাঁরা তপশ্চর্যা করবেন, এই সংকল্প নিলেন আঁটপুরে। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যরা বরানগর মঠে স্থাপন করেছিলেন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও একনিষ্ঠ সাধনার অভূতপূর্ব নির্দশন। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঠাকুরের জন্মতিথির আগে আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয় মঠ। ১৮৯০ সালের মাঝামাঝি সময়ে নরেন্দ্রনাথ বরানগর মঠ থেকে বেরিয়ে এলেন ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে। তারপর তিনি পৌঁছলেন শিকাগো ধর্মমহাসভায়। সাত বছর পর তিনি যখন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ রূপে মঠে ফিরে এলেন তখন মঠ রয়েছে আলমবাজারে। ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়—রামকৃষ্ণ মঠ। ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্বামীজী স্থাপন করলেন বেলুড় মঠ। এই বছরের ১ মে তারিখে স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন—রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৯৮ সালে পূর্ণাঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'। ২ জানুয়ারি, ১৮৯৯ হাওড়ার বেলুড়ে সংগঠনের নিজস্ব জমি ও বাড়িতে রামকৃষ্ণ ভাবধারার মূলকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০১ সালে একটি ট্রাস্ট হিসেবে রামকৃষ্ণ মঠ রেজিস্ট্রিকৃত হয়। বরানগরে মঠ চলাকালীন সময়ে বাবুরাম মহারাজের মায়ের আমন্ত্রণে নয়জন গুরুভাই হুগলির আঁটপুরে পৌঁছালেন। এখানেই ২৪ ডিসেম্বর তাঁরা ধুনি প্রজ্জ্বলিত করে পালন করলেন 'ত্যাগব্রত দিবস'।

একইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যধর্মী ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রম করে কন্যাকুমারীর শেষ শিলায় ওই দিনই ধ্যানে বসে (১৮৯২) অখণ্ড ভারত দিবস করে তুললেন, যখন সমগ্র ব্রিটিশ-ভারত যিশুর ভজনায় উৎসব-মুখর। ভাবা যায়! স্বামী বিবেকানন্দ এই কাজটি খুবই চিন্তাভাবনা নিয়েই করেছেন। যতদিন যাবে বিশ্ববাসী দেখতে পাবেন কন্যাকুমারীর পাষাণ শিলার স্বামীজী জীবন্ত হয়ে সীমানা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। ঘটনাচক্রে দিনটি ২৫ ডিসেম্বরের বড়দিন। কী ব্যতিক্রমী প্রতিস্পর্ধা! বিবেকানন্দ কেন্দ্র ওই দিনটি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পাষাণের মধ্যেই স্বামীজীকে বোধন করে খ্রিস্টধর্মকে অতিক্রম করে গেল এক নীরব বিপ্লবের মধ্যে। একেই বলে সাংস্কৃতিক-জাতীয়তা। □

মনগড়া কাহিনি না বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ?

বিপ্লব বিকাশ

শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, যাঁদের গাথা যুগ-যুগ ধরে ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয়ের প্রতীক। আজকের বৈজ্ঞানিক ও আইনি যুক্তির মাধ্যমে তাঁদের জন্মস্থান প্রমাণিত হয়েছে। এর জীবন্ত উদাহরণ শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দির, যা শুধু হিন্দু পুরুষার্থের প্রতীক নয়, বরং হিন্দুদের আস্থা এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়ের স্মারক। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বেশি বিশ্বাস রাখে। তাহলে যিশুর জন্ম তারিখকে সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যাচাই করা উচিত মনে হয়। সময় কি আসেনি যে ঈশ্বরপুত্রের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যকে সমানভাবে যাচাই ও স্বীকার করা? এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করলে এক বিচিত্র তথ্য পাওয়া যাবে। আশ্চর্যের বিষয় যে যিশুখ্রিস্টের জন্মের সঠিক বছর ও দিন এখনো অনিশ্চিত রয়ে গেছে। কারণ ঐতিহাসিক ও গবেষকরা তাঁর জন্ম সময় নির্ধারণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দলিল বা রেকর্ড খুঁজে পাননি। অনুমানগুলোও মনগড়া কাহিনির উপর নির্ভরশীল। বাইবেলের বিবরণ, শাসকদের ঐতিহাসিক উল্লেখগুলিও কপোলকল্পিত। তবে এই সূত্রগুলো প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে অমিল। উদাহরণস্বরূপ, মথি রচনায় যিশুর জন্ম হেরোড দ্য গ্রেটের শাসনামলে, যার চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বে মৃত্যু হয়। ফলে তার জন্ম ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে হতে পারে। কিন্তু লুক রচনায় যিশুর জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে সিরিয়ার গভর্নর কুইরিনিয়াসের অধীনে একটি জনগণনা, যা প্রায় ৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই অসামঞ্জস্যগুলি বাইবেলের বর্ণনাগুলিকে ঐতিহাসিক সময়সীমার সঙ্গে মিলানোর ঘটনা স্পষ্ট করে।

যিশুর জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কল্পিত ঘটনা, যেমন 'বেথলেহেমের তারা'। এর সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণাগুলি বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কিছু গবেষক দাবি করেছেন যে, তারাটি একটি বৃহৎ গ্রহ সংযুক্তি (যেমন, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের মিলন) বা ৫ খ্রিস্টপূর্বে একটি ধূমকেতু হতে পারে, কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলির পক্ষে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। এর সঙ্গে ডায়োনিসিয়াস এক্সিগাস, যিনি অ্যানো ডমিনাই (এডি) ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিলেন। তিনি সম্ভবত যিশুর জন্ম সালের হিসেব ভুল করেছিলেন। আধুনিক অনুমানগুলি সাধারণত ৬ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৪ খ্রিস্টপূর্বের মধ্যে তার জন্ম সন্নিবেশিত করে। যদিও যিশুর জন্মের ধর্মীয় তাৎপর্য তার সঠিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবু তার জন্মের সময় নির্ধারণে সমসাময়িক রেকর্ডের অভাব প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠনকে জটিল করে তোলে।

প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজে ক্যালেন্ডারের ধারণা অন্যান্য বেশিরভাগ সভ্যতার তুলনায় ছিল কম উন্নত। কিন্তু ভারতীয় পঞ্জিকা অত্যন্ত সঠিক ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দিকে ইউরোপীয় উপজাতিরা প্রধানত প্রাকৃতিক ঘটনা— যেমন চাঁদের গতিপথ এবং ঋতু পরিবর্তনগুলি তাদের অনুষ্ঠান পালন করতে ব্যবহার করত। এই প্রাথমিক বোঝাপড়া ছিল কেল্ট ও জার্মান উপজাতির মধ্যে যারা চান্দ্রমাস ও উৎসবগুলির মাধ্যমে সময় চিহ্নিত করত। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা তাদের ছিল না। এর বিপরীতে, ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা (যেমন পঞ্চাঙ্গ) প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা কৃষিচক্র, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে সংগতি সাধন করে।

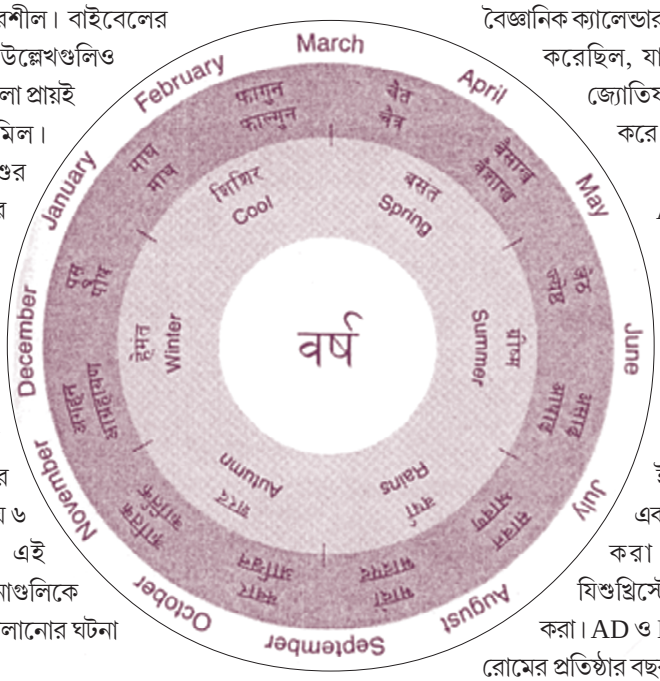

ভারতীয় ক্যালেন্ডার

গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারে ব্যবহৃত AD (Anno Domini) এবং BC (Before Christ) শব্দবন্ধ দুটি একটি রাজা নন, বরং একজন ষষ্ঠ শতকের সন্ন্যাসী ডায়োনিসিয়াস এক্সিগাস দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইস্টারের তারিখ নির্ধারণের জন্য একটি খ্রিস্টান-ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করা। পাশাপাশি ইতিহাসকে যিশুখ্রিস্টের জীবনদর্শনের সঙ্গে সমন্বয় করা। AD ও BC ব্যবহারের আগে রোমানরা রোমের প্রতিষ্ঠার বছর থেকে (Ab Urbe Condita, ৭৫৩ BCE) সময় গণনা করত, যেখানে মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা তাদের রাজাদের শাসনকাল বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে বছর গণনা করত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন খ্রিস্টান রিলিজিয়ন ইউরোপে প্রধান রিলিজিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ডায়োনিসিয়াস খ্রিস্টকে ইতিহাসের কেন্দ্রে রেখে একটি নতুন কালপরিক্রমার ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, যা ছিল প্যাগান বা মূর্তিপূজক রোমান সাম্রাজ্যিক রেফারেন্স থেকে

বিচ্যুত। Anno Domini শব্দটি লাতিন ভাষায় 'আমাদের প্রভুর বছর' বোঝায় এবং এটি সেই বছর থেকে গণনা করা হয়, যা ডায়োনিসিয়াস যিশুর জন্ম হিসেবে হিসেব করেছিলেন। তবে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন, তার হিসাবটি সম্ভবত ভুল ছিল, যিশুর জন্ম সঠিকভাবে ৪ থেকে ৬ BCE-র মধ্যে ঘটেছিল।

প্রাথমিকভাবে এই ব্যবস্থা সীমিত গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। তবে খ্রিস্টান রিলিজিয়ানের বিস্তার এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এটি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। BC (Before Christ) শব্দটি অষ্টম শতাব্দীতে ইংরেজ ইতিহাসবিদ বিড দ্য ভেনারেবল তাঁর The Ecclesiastical History of the English People গ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেন যিশুর জন্মের আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি চিহ্নিত করতে। AD ও BC পদ্ধতি যিশুখ্রিস্টকে ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যা তার জীবনকে মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে দেখানোর রিলিজিয়াস দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছিল। এই বিষয়টি গির্জার প্রভাবকে শক্তিশালী করেছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দবন্ধগুলির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান-কেন্দ্রিক পক্ষপাতিত্বের সমালোচনা হতে থাকে, বিশেষ করে পৃথিবীজুড়ে বৈচিত্র্যময় ও সেকুলার পরিবেশে। আধুনিক বিকল্প যেমন CE (Common Era) এবং BCE (Berore Common Era) একই সংখ্যাসূচক পদ্ধতি বজায় রাখলেও, এটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো প্রদান করে, যেখানে উপাসনা পদ্ধতির উল্লেখ এড়ানো হয়।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার

যিশুখ্রিস্টের জন্মবর্ষ যেরকম নিশ্চিত বলা অসম্ভব, তেমনই জন্মতারিখটাও বলা মুশকিল। তাহলে ২৫ ডিসেম্বর আমরা কী পালন করি? সেটা আদৌ কি যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন? প্রথম খ্রিস্টমাস কবে উদ্‌যাপিত হয়েছিল, তার সঠিক তারিখ খ্রিস্টীয় গ্রন্থ বাইবেলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মথি ও লুক-এর সুসমাচারগুলিতে যিশুর জন্মের কাহিনি দেওয়া হয়েছে, তবে কোনও নির্দিষ্ট বছর, তারিখ বা বার্ষিকভাবে উদ্‌যাপনের সুপারিশ করা হয়নি। প্রাথমিক পর্বে আবির্ভূত খ্রিস্টমতাবলম্বীরা প্রথমে যিশুর জন্ম উদ্‌যাপন করেননি, বরং তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং পুনরুত্থানের মতো ঘটনাগুলিতে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। তবে, প্রথম খ্রিস্টমাস উদ্‌যাপন ৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে হয়। কনস্টানটাইন ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান সম্রাট। পরবর্তীতে চতুর্থ শতাব্দীতে পোপ জুলিয়াস প্রথম ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। এতেই পরিষ্কার হয় যে ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের সত্যিকারে জন্মদিন নয়, বরং ঘোষিত জন্মদিন।

কিন্তু ২৫ ডিসেম্বরকেই যিশুর জন্মদিন কেন ঘোষণা করা হলো। এই বিষয় গবেষকদের মত হলো, ২৫ ডিসেম্বর তারিখটি হয়তো পূর্ববর্তী প্যাগান উৎসবগুলির প্রভাব হতে পারে, বিশেষ করে রোমান স্যাটার্নালিয়া উৎসব, যা শীতকালীন সৌরযাত্রার উৎসব ছিল এবং 'ডাইস ন্যাটালিস সোলিস ইনভিকটি' (রোমান সূর্যদেবতার জন্মদিন)। ৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের ক্রোনোগ্রাফ নামক চতুর্থ শতাব্দীর রোমান ক্যালেন্ডারটি প্রথম একটি প্রমাণপত্র যা ২৫ ডিসেম্বরকে খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে উল্লেখ করে এবং বিশ্বাস করা হয় যে, প্রথম পর্যায়ের খ্রিস্টানরা এই তারিখটি নির্বাচন করেছিলেন প্যাগান ঐতিহ্যগুলির জন্য একটি খ্রিস্টান বিকল্প প্রদান করার উদ্দেশ্যে। যিশুকে 'বিশ্বের আলো' হিসেবে দেখানোর প্রতীকটি সম্ভবত সূর্যের পুনর্জন্মের সঙ্গে সচেতনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যা বছরের সবচেয়ে ছোটো দিন ছিল।

খ্রিস্টমত প্রসারের প্রারম্ভিক পর্বে খ্রিস্টমাস উদ্‌যাপন ছিল যথেষ্ট সরল, যা বিশেষকরে গির্জার সেবা, প্রার্থনা এবং সম্ভবত আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসবটি বিভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহ্যগুলির সঙ্গে মিশে গিয়ে খ্রিস্টান উপাসনার সঙ্গে স্থানীয় প্রথাগুলির সংমিশ্রণ ঘটায়। ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টমাস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্তটি বাইবেলের নির্দেশনা অনুসারে নয়, বরং প্রাথমিক পর্বের খ্রিস্টান নেতাদের ইচ্ছা থেকে আসে, যারা এই দিনটিকে খ্রিস্টান উৎসব হিসেবে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহাসিক রেকর্ড অনুযায়ী, পোপ জুলিয়াস প্রথম এই তারিখটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিলেন আনুমানিক ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে, যাতে খ্রিস্টানদের মধ্যে এই মত প্রচার করা যায়। খ্রিস্টমতের মধ্যে প্রভু যিশু সংক্রান্ত একাধিক মত ও পথের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে রোমান শাসক কনস্টানটাইন ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে একটি সভার আয়োজন করেন, যার নাম ছিল— 'দ্য ফার্স্ট কাউন্সিল অব নাইসিয়া'।

একটি প্রশ্ন বারবার আসে, আমরা যে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নিজের জন্মদিন উদ্‌যাপন করি, সেই ক্যালেন্ডারটি যাঁর জন্মের উপর ভিত্তি করে তৈরি, তাঁর জন্মদিন কি নিশ্চিত প্রমাণিত?

২০২৪ অর্থাৎ ২০২৪ এডি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যাঁর জন্মের উপর ভিত্তি করে সময়ের এই গণনা, তাঁর জন্মের তারিখ কি আদৌ নির্ভুল? আজকের বিজ্ঞানের আলোকে যখন আমরা ঐতিহাসিক সত্য ও প্রমাণের ওপর নির্ভর করি, তখন কি এই ক্যালেন্ডারের ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়? বিশেষ করে, যখন এটি বিশ্বের অধিকাংশ সময় গণনার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সময় এসেছে, এই ক্যালেন্ডার এবং এর ঐতিহাসিক সত্যকে যাচাই করার। □

ক্রিসমাস উৎসব এবং পরিবেশগত কুপ্রভাব

ড. অলি ব্যানার্জি

বিশ্বে দুশো কোটিরও বেশি মানুষ ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি ক্রিসমাস উৎসব (গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মতে) উদ্‌যাপন করে থাকে। আর এই মাত্র দশ থেকে বারো দিনে টন টন বর্জ্য— কার্ড, উপহারের মোড়ক, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক আইটেম তৈরি, মাইল মাইল বর্জ্য উপাদান সৃষ্টি লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা থেকে শুরু করে খাবারের অপচয় প্রভৃতি বিশ্ব পরিবেশের গুরুতর ক্ষতিসাধন করে থাকে।

অরণ্যবিনাশ ও অরণ্যদূষণ :

ক্রিসমাসের প্রতীক হলো 'ক্রিসমাস ট্রি'। ব্রিটিশ ক্রিসমাস ট্রি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী প্রতি বছর ৭০ লক্ষ জৈবিক ক্রিসমাস ট্রি বিক্রি হয়। জৈবিক ক্রিসমাস ট্রির চাহিদা মেটাতে এর মনোকালচার মানে শুধু ক্রিসমাস ট্রি-এরই চাষ করা হয়, ফলে অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও একটি গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে তার জীবদ্দশায় কার্বন আলাদা করে, কিন্তু অনেক গাছ ক্রিসমাসের পরে পুড়িয়ে ফেলার জন্য সেই কার্বন আবার বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। গাছগুলিকে কোথাও ফেলে রাখলে ধীরে ধীরে পচার সময় আরও বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস (বিশেষত মিথেন) নির্গত করে।

অন্যদিকে কৃত্রিম ক্রিসমাস ট্রি (প্লাস্টিক, পিভিসি ও ধাতু দিয়ে তৈরি) পরিবেশের জন্য আরও ক্ষতিকর। কৃত্রিম গাছগুলি বেশিরভাগই চীনে তৈরি হয়, তাই তাদের উৎপাদনে এবং আন্তর্জাতিক পরিবহণের সময় অনেক রকম দূষণকারী এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। কৃত্রিম গাছগুলি নন-বায়োডিগ্রেডেবল, সেগুলি পোড়ালে বায়ুমণ্ডলে দূষিত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। সামগ্রিকভাবে, একটি কৃত্রিম গাছের কার্বন ফুটপ্রিন্ট 'ক্রিসমাসের পরে পোড়ানো আসল গাছের দশগুণ বেশি।

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, 'ব্রিটিশ রয়্যাল মেল' ক্রিসমাসের সময় ১৫০ মিলিয়ন কার্ড বিতরণ করে। তার সঙ্গে রয়েছে ব্রিটেনে বছরে এক বিলিয়ন কার্ড বিক্রি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ বিলিয়ন কার্ড

বিক্রি হয়। ৩ হাজার বড়দিনের কার্ড তৈরি করতে একটি গাছ প্রয়োজন। এই অনুসারে সারা বিশ্বে, শুধুমাত্র ক্রিসমাসের কার্ডের জন্য ৩৩ মিলিয়নেরও বেশি গাছ ধ্বংস হয়। প্রতি ক্রিসমাসে বিশ্বজুড়ে ১২০ মিলিয়নেরও বেশি গাছ কাটা হয়, মানে ২-৩ বিলিয়ন কিলোগ্রাম কার্বন ফুটপ্রিন্ট সৃষ্টি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্ষিক প্রায় ৮ মিলিয়ন গাছ ধ্বংস করে থাকে, কিন্তু তাদের বড়দিনের মরসুমে ৩৫ থেকে ৪০ মিলিয়ন গাছ বিক্রি হয়।

প্রতি বছর বড়দিনের সময় ২ লক্ষ ২৮ হাজার মাইল কাগজের মোড়ক ব্যবহৃত হয়। ২০১৮ সালে, ব্রিটিশরা বড়দিনের শেষে প্রায় ১০৮ মিলিয়ন রোল কাগজের মোড়ক ফেলে দিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনে অতিরিক্ত পাঁচ মিলিয়ন টন বর্জ্য তৈরি হয়, যার মধ্যে চার মিলিয়ন হলো কাগজের মোড়ক এবং শপিং ব্যাগ।

খাদ্য অপচয় এবং প্লাস্টিক বর্জ্য দূষণ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনের সময় ২ মিলিয়ন টার্কি, ৫ মিলিয়ন ক্রিসমাস পুডিং এবং ৭৪ মিলিয়ন মিনস পাই খাদ্যযোগ্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়, যার ফলে মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্য অপচয় হয়। অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতি বছর ৫ মিলিয়ন টনেরও বেশি খাদ্য নষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড়দিনে উৎপাদিত বর্জ্যের পরিমাণ বছরের বাকি সময়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ বেশি যা ২৫ মিলিয়ন টন আবর্জনা তৈরি করে। Biffa UK প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, বড়দিনের সময় আবর্জনা ব্যাগের সংখ্যা ১০০ মিলিয়নেরও বেশি হয়। বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং, কাগজের মোড়ক, কার্ড ও খাবারের অতিরিক্ত বর্জ্য বড়দিনের ছুটির মরসুমে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

উচ্চশব্দ ও আতশবাজি দূষণ :

শুধু মানুষ নয়, এই ক্রিসমাস উদ্‌যাপন প্রাণী ও অন্যান্য প্রজাতির জন্যও বিপজ্জনক। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে নববর্ষের প্রাক্কালে ইতালির রাজধানীতে প্রচুর আতশবাজি পোড়ানোর পরে শত শত পাখি মারা গিয়েছে। রোমের প্রধান রেল স্টেশনের কাছে রাস্তার ফুটেজে কয়েক ডজন বেশিরভাগই স্টারলিং পাখি মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি এটিকে ভয়াবহ 'প্রাণীহত্যা' বলে অভিহিত করে, 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই রিপোর্ট করেছে। ক্রিসমাস উদ্‌যাপনের সময় পটকা ব্যবহার কুকুর ও বিড়ালের মতো প্রাণীদেরও প্রভাবিত করে। উৎসবে উচ্চ আতশবাজির শব্দে বিভিন্ন প্রাণীদের নিখোঁজ হওয়া বা মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এর সঙ্গে আতশবাজি থেকে বায়ুদূষণ তো আছেই'।

যখন বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন এবং খাদ্য সংকট সমস্যায় জর্জরিত তখন বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপনের নামে বিশ্বব্যাপী এই অনাচার বন্ধ হওয়া আশু প্রয়োজন। □

পাগলের প্রলাপ

ভারতের প্রতিবেশী দেশ, যদিও সেটা ভিক্ষায় পাওয়া। ভারত থেকে পেঁয়াজ না গেলে যাদের রান্নাই হয় না। শুধু পেঁয়াজ কেন, প্রায় সবকিছুই ভারতের কাছ থেকে নিয়ে তবে তাদের সংসার চলে। তাদের আরেক দেউলিয়া বন্ধু অস্ত্র উপহার দিয়েছে, অবশ্য সেই দেউলিয়া বন্ধুটিরও অবস্থা তথৈবচ। আটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, গাধাই যাদের সমৃদ্ধির প্রতীক, তারাই নাকি আবার ত্রাণকর্তা!

সেই পড়শি দেশের এক প্রাক্তন সেনাকর্মী বলেছেন তারা নাকি কলকাতা দখল করে নেবে! পাগলের প্রলাপ আর কী! ১৯৭১ ভুলে গেল নাকি? যদিও তার মতে তাদের দেশ আর আগের মতো নেই, অনেক উন্নত হয়েছে। লজ্জাও লাগে না একথা বলতে! আর রইল উন্নতির কথা। বাংলাভাষার শ্রাদ্ধ তো কবেই হয়ে গেছে, শাড়ি এখন বোরখার পথে, নারীদের পথে বেরনো নিষেধ। লুটপাটটাই এখন প্রধান শিল্প। মহিলার অন্তর্বাস যেন অলিম্পিকে মেডেল জয়ের সমান— তাদের কাছে আর কীই-বা আশা করা যেতে পারে।

—চন্দ্রশেখর দাস,
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ওয়াকফ বোর্ড

একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে ওয়াকফ বোর্ড সম্পর্কে আমার কোনোরকম ধারণা ছিল না। আমি মনে করতাম, হিন্দুদের যেমন দেবোত্তর সম্পত্তি কিংবা মঠ-মন্দিরের সমিতি, সেরকমই মুসলমানদেরও ওয়াকফ বোর্ড। কিন্তু গত ২ ডিসেম্বরের স্বস্তিকা পত্রিকার মাধ্যমে আমার সেই ভ্রান্তির নিরসন ঘটলো। আমার মনে হয় দেশের অধিকাংশ হিন্দুর ধারণা আমার মতোই রয়েছে। স্বস্তিকার এই সংখ্যায় লেখক শিবেন্দ্র ত্রিপাঠীর লেখায় অবাক করার মতে বিষয় জানতে পারলাম যে, পাকিস্তানের জমির সমপরিমাণ জমি ভারতে ওয়াকফ বোর্ডের হাতে রয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ জবরদখল করে নেওয়া। যার অর্থ হলো মুসলমানরা আবার যে কোনো সময় ভারত ভাগের দাবি তুলতে পারে। লেখক ধর্মানন্দ দেব, দেবজিৎ সরকার, ভাস্কর চ্যাটার্জি, বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখের লেখায়ও বহু তথ্য পরিষ্কারভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে ধন্যবাদ যে তারা এই সত্যটি অনুধাবন করে ওয়াকফ সংশোধনী আইন আনতে চাইছে। আমার অবাক লাগছে যে, দেশের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলি এই কঠিন সত্যটি কেন বুঝতে পারছে না। কেন তারা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপক্ষেপের বিরোধিতায় নেমেছে। অবশ্য তারা তো দেশের মঙ্গল চায় না, তারা শুধু ভোটব্যাংকটিই বোঝে। তাদের ধিক্কার জানাই।

স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগকেও অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা উপযুক্ত সময়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ সংখ্যা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

—সাগরময় দত্ত,
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ফুলচাষ নাকি রাসায়নিক সারের বিজ্ঞাপন

গত ২৫ নভেম্বরের সংখ্যায় লেখক মিলন খামারিয়ার নিবন্ধ 'শীতকালীন অর্থকরী ফুল' পড়লাম। তবে, তা পড়ে ফুলচাষের চেয়ে রাসায়নিক সারের বিজ্ঞাপনটাকেই বোধহয় অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলেই আমার মতো বেশ কিছু পাঠকের ধারণা হয়েছে। যে পত্রিকা জৈবচাষ ও পরম্পরাগত চাষের উপর লেখা ছাপায় সেখানে লেখাটা কি বেমানান লাগছে না? লেখকের হয়তো ধারণা নাও থাকতে পারে সিকিমে বা প্রতিবেশী দেশ ভুটানের ফুলচাষ সত্যিই অভিভূত করে। আর উল্লেখিত স্থানগুলি সম্পূর্ণ জৈবচাষের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন। এছাড়া রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় যে ফুলচাষ হয়ে থাকে তা কতটা রাসায়নিক সারের ভরসাতে করে থাকে তা জানতে চাইছি নিবন্ধকারের কাছ থেকে।

যে কোনো চাষের ক্ষেত্রেই রাসায়নিক সারের যতই প্রয়োগ করুক না কেন, জৈবসারের ব্যবহারটাই থাকে সিংহভাগ। আর পরিবেশ দূষণের জন্যও রাসায়নিক সার যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী। বাড়িতে বাগান বা ফুলগাছ লাগানোর জন্য সবজির খোসা, চা-পাতা প্রভৃতি নানান জিনিস থেকে তৈরি করা সার অত্যন্ত সুলভ ও পরিবেশবান্ধব।

—দীনেশ দাস,
মুচিয়া, মালদা।

মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রাম হোক বাঙ্গালি হিন্দুর জীবনব্রত

বর্তমানে ইসলামি বাংলাদেশে চলছে— ইমানদারদের বেইমানির প্রতিযোগিতা। গত ৫ আগস্ট থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত, বাংলাদেশে ২০১০টি হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। বিরামহীন ভাবে প্রতিদিন চলছে তার ধারাবাহিকতা। বর্তমানে সেই দেশে ক্ষমতাসীন ড. ইবলিশ। তিনি ইসলামের প্রকৃত খাদেম। পাকিস্তানের খিদমদগার। মিষ্টিভাষী। কৌশলে হিন্দুশূন্য বাংলাদেশ দেখতে চান। ১৯৪৬ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত কয়েক লাখ হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। কেউ রাখেনি কোনো হিসাব। হয়নি কোনো বিচার। একাধিকবার হয়েছে হিন্দু গণহত্যা। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের লোকসভা-রাজ্যসভা থেকেছে নীরব। বাঙ্গালি হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বিধানসভা— 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কালিমালিপ্ত হওয়ার অজুহাতে চোখে ঠুলি, কানে তুলো দিয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস- কমিউনিস্ট সরকারগুলি বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পরিবর্তে নির্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। হিন্দুশূন্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের হাতিয়ার

হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস।

১৯৪৬ সালে, নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যার মাধ্যমে রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু। স্বাধীন বাংলাদেশে তার গতি অব্যাহত। পূর্ববঙ্গের কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা নিরীহ হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দিতে এগিয়ে আসেননি। হিন্দুদের ১৬.৮ লাখ হেক্টর বসত ও কৃষিজমি— 'শত্রু সম্পত্তি আইন'-এর গ্রাসে। ১০ লাখ একর দেবোত্তর সম্পত্তি লুঠের মাল। ৩৫ হাজার মন্দিরের মধ্যে এখন ১৫ হাজার মন্দির রয়েছে। ২৮ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যার মধ্যে বর্তমানে বেঁচে রয়েছে ৭.৮ শতাংশ। সেদেশের সরকারি পরিভাষায় বাকি হিন্দুরা নিখোঁজ। বাংলাদেশের হিন্দুরা সত্যিই কি নিখোঁজ? বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন। নির্যাতিত, বিতাড়িত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুরা এই পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ছিল অপরিসীম অবদান। বিনিময়ে তাদের পুরস্কার ইসলামিক পাকিস্তান। পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে হিন্দুদের পরিকল্পনা ও আত্মত্যাগ সীমাহীন। তার বিনিময়ে পুরস্কার নির্যাতন, বিতাড়ন। বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে আর কতদিন লাগবে? পাকিস্তানের পর এখন সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় ঘাঁটি হতে চলেছে বাংলাদেশ। প্রতিবেশী মায়ানমারও বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রে সন্ত্রাসের আগুনে জ্বলছে। আগামীদিনে উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ইসলামি সন্ত্রাসবাদের আগ্রাসনের গোপন পরিকল্পনা রয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চলছে গোপন যোগাযোগ ও যাতায়াত। রাজনৈতিক নেতা ভরসাকারী, খিচুড়িভোগী, পরকালে বিশ্বাসী বাংলাদেশের হিন্দু উদ্বাস্তুরা পালাবে কোন পাতাল লোকে? ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাগ্রে নেতা পালিয়েছে নিরাপদ স্থানে। মিশে গিয়েছে হারু পার্টির ঝাঁকে। খণ্ডিত অংশে নির্যাতিত আপন মানুষদের কথা এরা ভাবলো কোথায়? প্যালেস্তাইন নিয়ে কলকাতার রাস্তায় এরা চোখের জলের প্লাবন ঘটিয়ে দেয়। বাংলাভাষা আন্দোলন নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বচন ঝাড়ে, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে টুঁ-শব্দটি করে না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত হিন্দু শরণার্থীদের ভোট পাওয়ার জন্য এরা ভাঁওতা দেয়। অধিকার দেয় না।

ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্মভূমি আজ সেই হিন্দুদের কাছে বিদেশ। অসুরদের দখলে। এই ভয়ংকর সমস্যার সমাধান সেদেশের হিন্দুসমাজকেই করতে হবে। চাই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের প্রতি সহমর্মিতা। পৃথিবীর বুকে প্রয়োজন বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তু ঐক্য। ঐক্য আনবে শক্তি। শক্তি দেবে মুক্তি। বাংলাদেশের হিন্দুদের বজ্রকণ্ঠ চিন্ময়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারীর গর্জন আমরা শুনতে পাচ্ছি। তাঁরা বিশ্বমানবতার বিবেক জাগ্রত করছেন। বাংলাদেশের হিন্দুরা রাজপথে আন্দোলনরত। এই সময় আমরা কি সুখনিদ্রা যেতে পারি? বেরিয়ে আসতে হবে পথে। উদ্বাস্তু সঞ্জীবনী একমাত্র আন্দোলন। সঠিক আন্দোলনেই সুষ্ঠু সমাধান ফিরে পেতে পারে এপার-ওপারের বাঙ্গালি হিন্দুসমাজ।

ওরা বলে আমরা বাঙ্গালি। ওদের নামগুলো সব আরবি শব্দে কেন? ওরা ইসকনকে জবাই করার স্লোগান দেয়। আগামীদিনে কি ওরা ইসকনের জপের মালা দলে দলে ধারণ করবে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের উপহার। বাংলাদেশ ভারত-বিরোধিতা জারি রাখলে তাদের কপালে জুটবে অনাহার। পাকিস্তান এখন মিসকিনস্থান! খয়রাত খেয়ে বাঁচে জান। বাংলাদেশ কি সেই পথ অনুসরণ করতে চাইছে? পূর্ব পাকিস্তান সহাবস্থানের নীতি ত্যাগ করেছে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙ্গালি হিন্দুরা ছুটবে কেন মরীচিকার পিছে? মানসিকভাবে দুর্বল নেতাদের কাঁধে চেপে আসে দুর্নীতি। দুর্নীতির কাঁধে চেপে হয় দেশ, জাতি বিক্রি। দল ও নেতার হাত ছাড়ো, বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন গড়ে তোলো। পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র স্বাধীন হিন্দু হোমল্যান্ড গঠনের উদ্দেশ্যে এপার বঙ্গ, ওপার বঙ্গ-সহ পৃথিবীর সর্বত্র আওয়াজ তোলো। উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক আপামর হিন্দুসমাজের লক্ষ্য। মাতৃভূমি ভারত ও বাংলাদেশকে প্রণাম করে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াই হোক বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবনব্রত।

—সুভাষ চক্রবর্তী,
নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

দেশে কোটিপতির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ছে সাধারণ মানুষের আয়

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভারতে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। সেই প্রেক্ষিতে এই পত্রের অবতারণা। কোটিপতি বেড়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, টাকার মূল্য অনেক কমে গিয়েছে, আরও কমবে, কমতেই থাকবে। মুদ্রাস্ফীতি বজায় থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি সমাজ বা দেশকে পরিষেবা দানের বা কিছু উৎপাদনের মাধ্যমে যদি রোজগার করেন, তবে তিনি দেশের সম্পদ। কিন্তু কিছু উৎপাদন না করে বা কোনো পরিষেবা না দিয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে যদি রোজগার হয় তবে তা দেশের পক্ষে বিপদ। দেশে শুধু কোটিপতি বাড়েনি, বেড়েছে সাধারণ মানুষের এবং শ্রমিকের আয়। শ্রমিকের অভাবে জমিতে নাড়া পোড়াতে হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটছে। আমি ১৯৬০ সালের কাছাকাছি দেখেছি, তখন সাধারণ শ্রমিকের মজুরি ছিল তিন টাকা, এখন চারশো থেকে পাঁচশো টাকা। তিন টাকা মজুরির থাকার সময়ে রোজ কাজ পাওয়া যেত না। ফলে অর্ধাহারে থাকতে হতো। এখন কাজের অভাব নেই। এটা ঠিক, মনোমত কাজ পাওয়া যায় না। সরকার সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা, রেশন, ঘর দিচ্ছে। দেশজুড়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে চলছে নানান কেন্দ্রীয় প্রকল্প। অসম্ভব জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গিয়েছে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

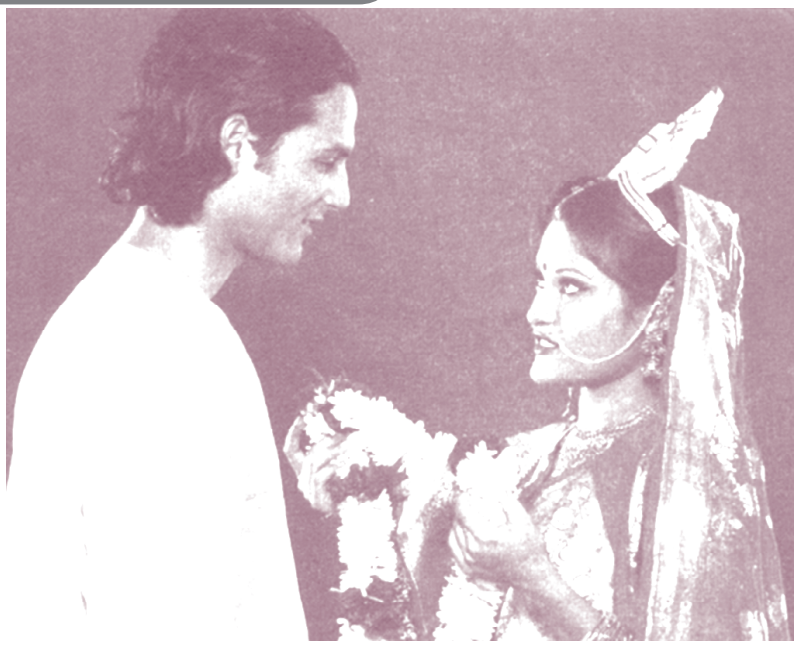

বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন

রূপশ্রী দত্ত

'যদিদং হৃদয়ং মম' পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে বিবাহলগ্নে যে দুটি হৃদয় এক হয়, সেই দুটি হৃদয়নদী সাবলীল গতিতে স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত হোক—এটাই কাঙ্ক্ষিত। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—'Marriage is settled in haven.' বাংলায় সেটাই মুখে মুখে প্রচলিত—'জন্ম মৃত্যু বিয়ে / তিন বিধাতা নিয়ে।' এই পূর্বনির্ধারিত সংস্কারটাই হয়তো অবচেতনে পারস্পরিক সমঝোতার অনুকূল মানসিকতাকে সাধারণত লালন করে।

তথাপি মানসিকতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো পরিস্থিতি অনেক সময়েই ঘনিয়ে আসে। তবে সুখের কথা, এখন মহামান্য আদালত বহুপ্রকারেই স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে সফল হচ্ছে। বিচ্ছেদকামী স্বামী-স্ত্রীকে বলেন—একত্রে কোথাও কাছে পিঠে ভ্রমণসূচী নির্ধারিত করতে। অনেক সময় প্রকৃতই ভিন্নতর এক বৈচিত্র্যময় পরিবেশে, স্বামী-স্ত্রীর নেতিবাচক মানসিকতা দূর হয়ে যায়। তাঁরা আবার স্বাভাবিক হন। এই প্রসঙ্গে আদালতের আর একটি সদর্থক মনোভাবের কথা মনে পড়ে। পুত্র-পুত্রবধূ যখন পিতা-মাতার বিরোধী পক্ষ হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন, আদালত নির্দেশ দেন—পিতা-মাতাকে সকালে প্রাত্যহিক প্রণামের। বয়োকনিষ্ঠ হিসেবে তাদের বলেন, কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে।

তাসত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে বাধ্য। সন্তানসন্ততি থাকলে তারা মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকে ও পিতার সঙ্গে সাপ্তাহিক দেখাশোনা আবশ্যিক—আদালতের নির্দেশে। এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় হলো পুনর্বিবাহ। বিচ্ছেদের পর যদি প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী অন্য পুরুষ বা নারীকে বিবাহ করেন। এর সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন থাকে, যদি কোনও নারী সন্তানসহ পুনর্বিবাহ করেন, তখন তাঁর স্বামী পূর্ববিবাহের সন্তানের সঙ্গে সহাবস্থানে রাজি হবেন কিনা। এই ধরনের ব্যাপার তো কোনও চুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রাক্-বিবাহ প্রতিশ্রুতিরও কোনও মূল্য নেই। আবার এ-ও দেখা গেছে, সৎ-পিতা স্ত্রীর পূর্ববিবাহের সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হলেও সেই সন্তান তাঁকে কোনও দিনই আসল পিতার ভাবমূর্তি বিস্মৃত হয়ে পিতার আসনে সশ্রদ্ধভাবে বসাতে পারে না।

স্বামীর পূর্বপক্ষের সন্তানরা আসে তাদের পিতার সঙ্গে দেখা করতে, আবার স্ত্রীর পূর্বপক্ষের সন্তানরাও আসছে তাদের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে—পারস্পরিক সুসম্পর্কে এমনও দেখা যায়। আবার এই দম্পতির বর্তমান বিবাহজাত সন্তানও এমনতরো মিলনোৎসবে সানন্দে যোগদান করছে, তা-ও সাম্প্রতিকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়।

বাংলা ছবিতে বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মর্মস্পর্শী নিদর্শন হলো, সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ'। অনেক বছর পরে দুটি সমান্তরাল ট্রেনের অল্প বিরতিতে বিবাহবিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয়। আবেগমথিত, দু-একটি কথা বলতে না বলতেই, প্রতীকী রূপে দুটি ট্রেন দু'দিকে চলে যায়।

আর এক বিচিত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। হলিউডের কিংবদন্তী অভিনেতা অভিনেত্রী—রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর সাতবার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন আর সাতবার পুনরায় নিজেরাই পরস্পর পূর্বের মতো বিবাহিত হয়েছিলেন। □

মুখের আলসার কী ও কেন?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কারণে মুখের ভিতরের স্তরে মিউকাস মেমব্রেনের সংবেদনশীল টিসু, মাড়ি, তালু, জিভ বা গালের ভিতরের অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে তা থেকে মুখের ঘা বা আলসার হয়ে থাকে। কিন্তু মাউথ আলসার নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

আলসারের কারণ

- খাওয়ার সময়ে বারবার গালে কামড়।
- অতিরিক্ত মশলাদার খাবার বা টক জাতীয় (সিট্রাস) ফল খাওয়া।
- যাঁরা দাঁতের ক্লিপ পরেন, তাঁদের গালের ভিতরের অংশ এবং মাড়িতে ঘষা লাগে।
- ধূমপান, মদ্যপান বা তামাকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে।
- মানসিক চাপ, উদ্বেগ, কম ঘুমের কারণ হতে পারে।
- গর্ভাবস্থা, বয়ঃসন্ধি এবং মেনোপজের সময়ে হরমোনের পরিবর্তন।
- জেনেটিক কারণ।
- অপুষ্টি, ভিটামিন বি-১২, আয়রনের ঘাটতি।
- ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রাক সংক্রমণ।

প্রকারভেদ

চিকিৎসকের কথায়, সাধারণত তিন ধরনের আলসার দেখা যায়। যেমন :

- **অ্যাপথাস আলসার বা ক্যাঙ্কার :** জিভের উপরে এক বা একাধিক ছোপছোপ সাদা রঙের ঘা দেখা যায়। তার চারদিকে লাল রিঙের মতো হয়ে থাকে। এই সময় গরম, মশলাদার খাবার ও পানীয় খেলে জিভের মধ্যে জ্বালা অনুভূত হয়। এই ধরনের আলসার কদিন পরে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে আবার ফিরে আসতেও পারে।
- **লিউকোপ্লাকিয়া :** মাড়ি, জিভ, মুখের উপর তালুতে সাদা ঘন দাগ দেখা যায়। এই অবস্থাকে লিউকোপ্লাকিয়া বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিউকোপ্লাকিয়া ক্যানসারবিহীন। তবে এগুলি ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। তামাকজাত দ্রব্য সেবনের কারণেই মূলত এই ধরনের আলসার হয়ে থাকে। তাই এই লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- **এরিথ্রোপ্লাকিয়া বা লাইকেন প্ল্যানাস :** সাধারণত আমাদের সামনের দাঁত ও ঠোঁটের মাঝে লাল রঙের ঘা বা আলসার হয়, একে এরিথ্রোপ্লাকিয়া বলে। এটির চিকিৎসা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময়েই এটি প্রাক্-ক্যানসার অবস্থা হতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ও ধূমপানকারীদের ক্ষেত্রে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি।

আরও বেশ কিছু আলসার দেখা যায় :

- **ওরাল থ্রাশ :** ক্যান্ডিডিয়া ছত্রাকের আক্রমণের ফলে জিভের উপরিভাগে সাদাটে আবরণের মতো দেখা যায়। একে ক্যান্ডিডিয়াসিস বা ওরাল থ্রাশ বলে। এটি সাধারণত নবজাতক এবং শিশুদের মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। দুধ খাওয়ার পর নবজাতক অথবা শিশুর মুখ পরিষ্কার না করলে এ ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সাধারণত ক্যানসার, ডায়াবিটিস, এইচআইভির মতো রোগ থাকলে, দীর্ঘ দিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েড এবং অন্যান্য ওষুধ খাওয়ার ফলে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। সেক্ষেত্রে তখন রোগাক্রান্তের মুখে ছত্রাক বাসা বাঁধতে পারে।
- **অ্যাঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস :** প্রোটিন, আয়রন বা ভিটামিন বি-র অভাবে ঠোঁটের দু' কোনা ফেরে গিয়ে সাদা হয়ে ফুলে যায়। সেই ফাটা জায়গায় ছত্রাক সংক্রমণের ফলে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ধূমপান, ফেস মাস্ক ব্যবহার, মানসিক চাপের ফলেও এই আলসার হতে পারে।
- **মাউথ ক্যানসার :** ওরাল ক্যানসার যাকে ওরাল কাভিটি ক্যানসারও বলা হয়ে থাকে। মুখ, জিভ, ঠোঁট, গালের ভিতরের দিকে এবং গলার পিছনে সাদা বা লাল রঙের ঘা দেখা যায়। এগুলি সহজে নিরাময় হয় না। সেই সঙ্গে গাল, জিভ বা ঠোঁটে সাধারণত মাংসপিণ্ড তৈরি হয়। এছাড়াও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, খাবার চিবানো, গিলতে সমস্যা, চোয়ালে ব্যথা, মাড়ি ফুলে যাওয়ার মতো একাধিক সমস্যা দেখা যায়। ধূমপান, মদ্যপান, তামাকজাত দ্রব্য সেবনের ফলে, এইচপিভি বা হিউম্যান প্যাপিলোভাইরাস সংক্রমণে মাউথ ক্যানসার হতে পারে।
- **যৌন রোগ :** অসুরক্ষিত সহবাসের ফলে সিফিলিসি, গনেরিয়ার মতো ব্যাক্টিরিয়াঘটিত যৌনরোগ দেখা যায়। এটি মূলত যৌনাঙ্গে দেখা গেলেও চুম্বন ও মুখমেথনের মাধ্যমে ঠোঁটে, জিভে ও মুখের ভিতরে ব্যথাহীন ঘা বা আলসার হতে পারে।
- **অটোইমিউন ডিজিজের প্রভাবে :** সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমাটোসাস (এসএলই) বা সংক্ষেপে লুপাস। এটি একটি ক্রনিক অটোইমিউন রোগ। এর ফলে মুখে লাল রঙের র‍্যাশ বেরোয়। এছাড়াও কপাল, নাকের চারপাশ এবং গালেও র‍্যাশ বেরোতে দেখা যায়। একে 'বাটারফ্লাই র‍্যাশ' বলে। এক্ষেত্রে ব্যথা বা জ্বালা অনুভূত হয় না। ২০-৪৫ বছর বয়সি মহিলাদের এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি।

আলসারের চিকিৎসা

ব্যথা কমতে বেনজোকেইন বা কর্টিকোস্টেরয়েড যুক্ত মলম ব্যবহার করা যায়। মুখের আলসার হতে পারে এমন খাদ্য ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। মুখের স্বাস্থ্য বজায় রাখা দরকার, যাতে ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণ না হয়।

কোন ধরনের আলসার থেকে ক্যানসার বা অন্য রোগ হতে পারে, তা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানসিক চাপও মুখের আলসারের কারণ হয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়। □

তুলসী পূজন দিবস পালনের গুরুত্ব

মিলন খামারিয়া

প্রাচীনকাল থেকে তুলসীগাছের পূজা করা হয়ে আসছে সনাতন ধর্মে। এর ভেষজ গুণ অপরিসীম। বিভিন্ন রোগের প্রতিকার করার জন্য তুলসীগাছের পাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সনাতন ধর্মে তুলসীগাছকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়। প্রতিটি হিন্দুর বাড়িতেই তুলসীগাছ দেখি আমরা। প্রতিদিন সকালে তুলসীগাছের বেদী ধুয়ে গাছে জল দেওয়া হয় আর সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া হয়। তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রপাঠ করা হয়।

এখন কথা হলো, প্রতিদিন তুলসীগাছের পূজা করা হলেও ২৫ ডিসেম্বর কেন 'তুলসী পূজন দিবস' পালন করার প্রয়োজন পড়ল? সনাতন ধর্মে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পালন করা হয় 'তুলসী বিবাহ'। একাধিক জায়গায় ৫ দিন ধরে পালিত হয় তুলসী বিবাহ। বিষ্ণুদেব (শালগ্রাম শিলা)-এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তুলসী দেবীর (লক্ষ্মীর)। দেবতা বিষ্ণু দীর্ঘ ৪ মাস পরে জেগে উঠলে শুরু হয় বিবাহ পর্ব। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে পালিত হয় 'তুলসী বিবাহ'।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে রাক্ষস বংশের কন্যা বৃন্দা ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত। তাঁর বিয়ে হয়েছিল জলন্ধর (শঙ্খচূড়) রাক্ষসের সঙ্গে। স্বামী যুদ্ধে গেলে তিনি ঈশ্বর আরাধনা করতেন। জলন্ধরকে পরাস্ত করতে সমস্ত দেবতা দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিষ্ণুর। এরপরে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে নষ্ট করেন বৃন্দার পতিব্রত ধর্ম। যুদ্ধে মৃত্যু হয় জলন্ধরের। সমস্ত ছল জানার পরে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বৃন্দা। তখনই নারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলায় পরিণত হয়েছিলেন ভগবান বিষ্ণু। দেবী লক্ষ্মী বৃন্দার শরণাপন্ন হলে বৃন্দা সেই শাপ প্রত্যাহার করেন। তবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বৃন্দা। তাঁর চিতাভস্ম থেকে জন্ম নেয় একটি চারা— 'তুলসী'। এরপর বিষ্ণু নিজের একটি রূপকে পাথরে (শালগ্রাম শিলা) পরিণত করেন। তুলসী ছাড়া তাই বিষ্ণু প্রসাদ হয় না।

ভগবান বিষ্ণুরই অন্য রূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম। তাই তাঁদের প্রসাদেও থাকে তুলসীপাতা। সেই সঙ্গে থাকে চন্দন। তুলসী কিন্তু একটি ঘোরতর অন্যায়ও করেছিল। রামের অনুপস্থিতিতে সীতামাতা তাঁর শ্বশুর দশরথের পিণ্ডদান করেছিলেন বালি দিয়ে। সাক্ষী ছিল ফল্গু নদী, পুরোহিত ব্রাহ্মণ, তুলসী ও বটগাছ। শ্রীরামচন্দ্র এলে বটগাছ ছাড়া সকলেই মিথ্যাচার করে। তখন ৩ জনকেই অভিশাপ দেন সীতামাতা। অভিশাপ ছিল, তুলসীর শরীরে কুকুর ও শেয়াল প্রস্রাব করবে।

অনেকেই বলেন, সনাতন ধর্মের সব পূজাই তিথি অনুসারে হয় তাহলে তুলসী পূজা কেন খ্রিস্টানদের ক্যালেন্ডার মেনে ২৫ ডিসেম্বর পালন করা হচ্ছে?

মনে রাখতে হবে, ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন হিসেবে পালন করা হয়। কিন্তু এ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি নয়। এই

কলোনিয়াল হ্যাংওভারকে কাটাতে চেয়েছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও।

স্বামীজী অন্য ধর্ম থেকে ভাব নেবার ব্যাপারে ভীষণ সচেতন ছিলেন। যিশুর সামাজিক সাম্যনীতি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে থাকবে; জগতের কল্যাণের জন্য যে ত্যাগ দরকার হয়, তার রসদও যিশুখ্রিস্টের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকবেন। এখন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার পর মানুষ স্বভাবতই তাদের অনুসৃত মতের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রম করতে মনস্থ হয়। কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির মান্য মতকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজীও হয়তো সেই বিদেশি মতাশ্রয়ী পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের দ্বারা উদ্‌যাপিত প্রভু যিশুর তথাকথিত জন্মের দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটি হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন। তার এক দুটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

প্রথম, ১৮৮৬ সালের বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় (১৩ পৌষ, ১২৯৩) নয়জন গুরুভাই হুগলির আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভারতের অধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। অন্যদিনও তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তার বেশ কয়েকদিন আগেই পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৮৬ সালেই আগস্ট মাসে ঠাকুরের শরীর যায়। সেদিন অশ্বত্থতলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন গভীর ধ্যানে, তারপর ঈশ্বর আলোচনা। জানা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ যিশুখ্রিস্টের কথা সেদিন বলেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৯২ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বরের। স্থান কন্যাকুমারী। আবারও ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। বড়দিন-ই বটে, তার প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছেছেন তিনি। তারপর মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরে ৫০০ মিটার সাঁতর দিয়ে ভারতীয় পাহাড়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছলেন; দেখলেন অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, তারপর অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য গ্রহণ করলেন এক আধ্যাত্মিক সংকল্প। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো— ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর।

যারা মানুষকে 'পাপী' বলে, তার প্রতিবাদই কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও। মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম; সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ; পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই তার মধ্যে আছে। হিন্দুধর্মের প্রচারে আনুকূল্য পাবার জন্য যতটুকু যিশু-ভজনা দরকার স্বামীজী তাই করেছেন। তিনি জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার ধারায় ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ। তাই বড়দিনের মতো দিনটির মধ্যে সনাতন ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের বীজ বপন করে দিলেন তিনি। এটা ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্তিরই সাধনা, সাধনা পাশ্চাত্যধর্মী ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রমের।

২৫ ডিসেম্বর তুলসী পূজন দিবসে হিন্দুদের অনেকের বাড়িতেই তুলসী পূজা হয়ে থাকে, পালন করা হয় 'তুলসী জয়ন্তী'। তুলসীকে বলা হয় 'কৃষ্ণপ্রেয়সী' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তুলসী ছাড়া শ্রীনারায়ণ পূজা বা শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না। স্কন্দ পুরাণ ও পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে— 'যে বাড়িতে তুলসীগাছ থাকে সেই বাড়ি তীর্থে পরিণত হয়।' গড়ুর পুরাণে বলা হয়েছে— 'তুলসী গাছ রোপণ, দান এবং তুলসীগাছের যত্ন নিলে মানুষের পূর্ব জন্মের পাপ ক্ষয় হয়।'

দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির, যোগ বেদান্ত সেবা সমিতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ২৫ ডিসেম্বর পালন করে 'তুলসী পূজন দিবস'। এই দিন নতুন তুলসী চারা রোপণ করে তার পূজা করা হয় হিন্দু ধর্মে। আর খ্রিস্টান মতে পাইন, ফার, স্প্রুস প্রভৃতি গাছ কেটে ক্রিসমাস ট্রি' বানিয়ে তাতে টুনি লাইট জ্বালিয়ে উৎসব পালন করা হয়। হিন্দুধর্মে গাছ বাঁচানোর প্রাচীনকাল থেকে গাছের পূজা করা হয়ে থাকে সেই গাছের গুরুত্ব ইদানীংকালে পাশ্চাত্যের মানুষ উপলব্ধি করছেন।

হিন্দু বাঙ্গালিরা আজকাল বড়দিন পালন করছে খ্রিস্টানদের মতোই। নিজের ধর্মের ইতুপূজা, গারসি, বিভিন্ন ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি ভুলে বাঙ্গালির বিদেশি সংস্কৃতি নিয়ে মাতামাতি আসলে 'হুজুগ'। বাড়িতে প্লাস্টিকের গাছ বাজার থেকে কিনে এনে তাতে টুনি লাইট জ্বালিয়ে সান্টার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করা নাকি আধুনিকতা! আর নিজের সংস্কৃতির পূজা-পার্বণ করা নাকি 'ব্যাকডেটেড থট' বা পুরনো ভাবনা!

আচার্য চাণক্য বলেছেন, যদি কোনো দেশ বা সভ্যতাকে ধ্বংস করতে হয় তাহলে তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিলেই যথেষ্ট।

আত্মঘাতী বাঙ্গালি ভুলে যাচ্ছে যে, খ্রিস্টানদের বড়দিন পালন আসলে নিজের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া। মানসিক দুর্বলতা থেকেই অন্য মতকে গ্রহণ করার মানসিক স্থিতি তৈরি হয়। তাই দিকে দিকে খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরণের কাজ করে চলেছে, এ অশনিসংকেত। সেজন্য অন্য মতের উৎসব পালন না করে নিজের ধর্মের তুলসীগাছ পূজা করা অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। পাড়ায় পাড়ায় হোক মা তুলসীর আরাধনা। মন্দির গড়ে বড়ো করে হোক পূজা।

তুলসীগাছ যেমন বাতাস বিশুদ্ধ করে, তেমন 'তুলসী পূজন দিবস' পালনের মাধ্যমে হিন্দু সংস্কৃতি বিশুদ্ধ হোক। প্রতিটি হিন্দুর উচিত ২৫ ডিসেম্বর তুলসী পূজা করা। নিয়ম মেনে তুলসীর পূজা করলে মাতুলসী, মালক্ষ্মী ও শ্রীবিষ্ণুর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। এছাড়া স্তোত্র পাঠ করলেও সুফল পাওয়া যায়। ■

কলামন্দিরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ৪২তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী রতনলাল গাডিয়া। মুখ্য বক্তা শ্রীমতী শকুন্তলা বাগড়ী এবং হওড়া মহানগরের কার্যকরী সভাপতি দীনেশ কুমার

হিসেবে ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যেন্দ্র সিংহ। উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি ডাঃ চুনারাম মুর্মু, কলকাতা মহানগরের সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধরী, মহানগর মহিলা সমিতির সভানেত্রী কাকরানিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। তারপর মঞ্চাসীন অতিথিবর্গ রানি দুর্গাবতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে কল্যাণ ভারতী মাসিক পত্রিকার উন্মোচন করেন।

মুখ্য বক্তা হিসেবে শ্রী সিংহ তাঁর ভাষণে জনজাতি সমাজের উত্থানে কল্যাণ আশ্রমের ভূমিকা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এই মহতী কাজে কলকাতা ও হাওড়ার মতো শহরের মানুষদের সহযোগিতা খুবই প্রশংসনীয়। তিনি স্বদেশ ও স্বধর্ম রক্ষায় রানি দুর্গাবতীর জীবনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা-হাওড়া মহানগর সম্ভাগ প্রমুখ সন্দীপ চৌধরী। শ্রীমতী তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীতের পর প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশিত হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাবা সত্যনারায়ণ মৌর্যের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'দুর্গা থেকে দুর্গাবতী— এক নিরন্তর সংঘর্ষ যাত্রা।' চিত্রাঙ্কন, গান ও সংলাপে সুসজ্জিত তাঁর চিত্তাকর্ষক প্রস্তুতি দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বাগুইআটিতে বাঙ্গালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতির প্রতিবাদ মিছিল

গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতার উত্তরপূর্ব ভাগের লোকনাথ নগরে বাঙ্গালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয় বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে। বিকাল ৫-৩০ মিনিটে হাতিয়াড়া নিউমার্কেট থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৭ টায় বাগুইআটি নেতাজী মূর্তির পাদদেশে মিছিল সমাপ্ত হয়।

এই মিছিলে বহু মানুষ সম্মিলিত হন। শেষে একটি জনসভাও করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বলরাম সাঁতরা ও দিব্যজ্যোতি চৌধুরী।

অমৃতসরে সহকার ভারতীর রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ৬ থেকে ৮ ডিসেম্বর পঞ্জাবের অমৃতসরের রেলওয়ে কলোনি ময়দানে সম্পন্ন হলো সহকার ভারতীর অষ্টম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। তিনদিনের এই অধিবেশনে দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকে প্রায় তিন হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ৬ ডিসেম্বর সংগঠনের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ দীননাথ ঠাকুর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করী, পঞ্জাবের রাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটারিয়া, গুজরাট বিধানসভার স্পিকার শঙ্কর রায়চৌধুরী, সহকার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. উদয় জোশী, কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় পাচপোর ।

রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি জেলা থেকে ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। তাদের মধ্যে রাজ্য ও জেলা কমিটির

৪৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও চা সমবায় কমিটির ৯৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

অধিবেশনে আগামী তিনবছরের জন্য সমবায় ক্ষেত্রে উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। তিনবছরের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি ও কার্যকারিণী সমিতি নির্বাচন করা হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক এবং তার সঙ্গে পূর্বক্ষেত্রের (পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, আন্দামান ও সিকিম) সংগঠন সম্পাদক নির্বাচিত হন বিবেকানন্দ পাত্র। মহিলা বিভাগে সম্পাদক নন্দিনী রায়, তন্তুবায় প্রকোষ্ঠে সহ প্রমুখ সপ্তর্ষি সিংহরায়, এফপিও সহ প্রমুখ উৎপল জালান, ডিসিসিবি সহ প্রমুখ মদনমোহন ঘোষ এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাস নির্বাচিত হন। এছাড়াও কার্যকারিণী সদস্য মনোনীত হন শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জি, আলোক মুখার্জি, অশোক রায়, নিরুপম ব্যানার্জি প্রমথ সরকার। অধিবেশনে সহকার ভারতীর সামাজিক উপযোগিতা এবং সঙ্ঘের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করেন সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে। সারা দেশে সমবায়ের নানাবিধ উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করী।

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৩ নভেম্বর বর্ধমান জেলার রাধারানি স্টেডিয়ামের নিলয় সভাগারে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের ৪১তম রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা ও তালুক আদালত থেকে আইনজীবীরা উপস্থিত হন। সংগঠনের চারটি আয়ামের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে পঞ্চপণ রূপায়ণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এছাড়াও নতুন আইন নিয়ে প্রবীণ আইনজীবীগণ বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় ধরনা ও মানববন্ধন

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে গত ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বাঙ্গালি হিন্দু সুরক্ষা সমিতির ডাকে কলকাতার বুকে সংঘটিত হয় প্রতিবাদ ধরনা ও মানব বন্ধন। এদিন শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ে, শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের সামনে দুপুর ১টা হতে শুরু হয় ধরনা কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন— স্বামী উপাসনানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী, বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রভাত কুমার সিংহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মধুসূদন কর, কলকাতা মহানগরের উত্তর ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তাপস গড়াই, সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, কলকাতা মহানগর কার্যবাহ বিভাস মজুমদার, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সম্পাদিকা শিল্পা মণ্ডল, বিদ্যার্থী পরিষদের বারাসত জেলা সহ-সম্পাদিকা তিথি বিশ্বাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার-প্রসার প্রমুখ অরিন্দম কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রকাশচন্দ্র দাস, দিব্যজ্যোতি চৌধুরী প্রবীর বসু-সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের কার্যকর্তারা।

ধরনামঞ্চ হতে বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বর। যে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন আজ সংঘটিত হয়ে চলেছে সেদেশের বুকে তার বিভিন্ন প্রমাণ তাঁরা তুলে ধরেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কয়েক হাজার ভারতীয় সেনার বলিদানের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তার আগে সেদেশের বুকে সংঘটিত হয়েছিল পাকিস্তানি সেনা এবং রাজাকার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার ও নরহত্যা। আজ ৫৩ বছর পর ফের সেই খুনি, জেহাদি রাজাকারের দল বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হয়েছে এবং হিন্দুদের ওপর শুরু হয়েছে বীভৎস অত্যাচার। হিন্দু সন্ন্যাসীরা জেহাদি আক্রমণের নিশানা হয়েছেন, বিভিন্ন মঠ-মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া চলছে। বাংলাদেশ সরকারের মদতে সেই দেশজুড়ে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং বামপন্থীদের কোনোরকম হেলদোল নেই। বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষা আন্দোলনের বড়াই করা তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠনগুলি বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতা বা অন্যত্র কোনো সভা, সমাবেশ, পদযাত্রা আয়োজন করেনি। কোনো রকম প্রতিবাদে গর্জে ওঠেনি। বক্তাদের বক্তব্যে এই সমস্ত বিষয়সমূহ উত্থাপিত হওয়া ছাড়াও ধরনামঞ্চ থেকে বিশেষভাবে ওঠে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর মুক্তির দাবি। এরপর বিকাল ৪টায় শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তির চারদিক ঘিরে হিন্দুরা গড়ে তোলেন মানব বন্ধন। এথনিক ক্লিনজিঙের শিকার হওয়া বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের পাশে থাকার শপথ গ্রহণ করে এই মানব বন্ধন। বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন সবাই। তার মদতে বাংলাদেশ জুড়ে চলছে হিন্দু নিধন পর্ব। মানব-বন্ধন চলাকালীন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কেন্দ্রে মহম্মদ ইউনুসের কুশপুত্তলিকায় জুতোর মালা পরানো হয় এবং সেই কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। বাংলাদেশে জেহাদি শক্তির উত্থান এবং তাদের দ্বারা হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে হিন্দুসমাজের সম্মিলিত প্রতিবাদের সাক্ষী থাকল কলকাতা শহর।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক সমরসতা দিবস পালন

গত ৬ ডিসেম্বর কলকাতার মানিকতলা-স্থিত রামমোহন লাইব্রেরির সভাকক্ষে বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ৬৮তম প্রয়াণ দিবস স্মরণে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কলকাতা মহানগরের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় 'সামাজিক সমরসতা দিবস'। সামাজিক সমরসতা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে এদিন আয়োজিত হয় 'পে ব্যাক টু দ্য সোসাইটি'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা এবং সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের পূর্বতন নির্দেশক, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউজিসি-মালব্য মিশন টিচার ট্রেনিং সেন্টার (এমএমটিটিসি)-এর নির্দেশক ড. লক্ষ্মী-নারায়ণ শতপথী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অসিতবরণ বিশ্বাস এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা মহানগর সম্পাদক দেবাঞ্জন পাল। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে বাবাসাহেব আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা সংবিধান সভার অন্তর্গত ২২টি কমিটির মধ্যে অন্যতম ছিল ড্রাফটিং (খসড়া) কমিটি। বাবাসাহেব ছিলেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান। তাঁর সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় সংবিধান রচনা এবং প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন হয়। স্বাধীন ভারত সরকারের তিনি ছিলেন আইন ও বিচার মন্ত্রী। এদিনের সভায় বক্তারা বলেন যে বাবাসাহেবের সময়ে প্রণীত সংবিধানে সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হলেও পরবর্তীকালে সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদের অনবরত অপব্যাখ্যা এবং একাধিকবার সংবিধান সংশোধনের ফলে প্রভাবিত হয়েছে বাবাসাহেব প্রবর্তিত সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ। সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে, সেখানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দবন্ধ সংযোজিত হয়েছে যা ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান সভা প্রণীত মূল সংবিধানে ছিল না। এছাড়াও জম্মু-কাশ্মীর বিষয়ক ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ তাঁর লিখিত নয়। এই অনুচ্ছেদ প্রণয়নে তিনি অস্বীকৃত হয়েছিলেন। সংবিধানে এহেন অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্তির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে হলে দেশজুড়ে তাঁর প্রবর্তিত চিন্তাধারার প্রচার-প্রসার বিশেষ জরুরি বলে বক্তারা মতপ্রকাশ করেন। এরপরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। আবৃত্তি, নৃত্য, সমবেত সংগীত পরিবেশন-সহ একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁরা। কলকাতার আনন্দপুর হতে আগত মতুয়া সমাজের একটি সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের শিল্পীরা পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সংগীত এবং সংকীর্তন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাঘরটি ছিল পরিপূর্ণ।

‘বরানগর সনাতনী হিন্দু সেনা’র উদ্যোগে প্রতিবাদী পদযাত্রা

বাংলাদেশের বুকে হিন্দুসমাজের উপর জেহাদি শক্তির নৃশংস, বর্বরোচিত আক্রমণ, হিন্দু মা-বোনেদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং চট্টগ্রাম পুণ্ডরীক ধামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস মহারাজের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গত ৮ ডিসেম্বর বরানগর সনাতনী হিন্দু সেনা এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বরাহনগর জেলা সমিতির উদ্যোগে উত্তর কলকাতার সিঁথির মোড় সার্কাস ময়দানের সামনে থেকে ডানলপ মোড় পর্যন্ত আয়োজিত হয় একটি পদযাত্রা। পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দ নাথ ভৈরবগিরি মহারাজ। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মহানগরের উত্তর ভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যভাগ প্রচারক তাপস গড়াই, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা কিরণময় দেবনাথ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার কার্যকর্তা সুমিত দাশ, রাজা দে, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথ মণ্ডল-সহ অসংখ্য রাষ্ট্রবাদী মানুষ। পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা সবাই বাংলাদেশে ঘটমান হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হন। পদযাত্রায় মুহুর্মুহু স্লোগান ওঠে বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন জেহাদিদের বিরুদ্ধে। পদযাত্রার শেষে তাঁর বক্তব্যে হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তি এবং বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধের দাবি জোরালোভাবে উত্থাপন করেন স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ।

বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ১০ ডিসেম্বর হলো ভারত জননীর বীর সন্তান এবং ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম হুতাত্মা প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিন। প্রতি বছরের মতো এই বছরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ১০ ডিসেম্বর কলকাতার লালদিঘির পাড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর আবক্ষ মূর্তির সামনে আয়োজিত হয় একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁকে সম্মান জানান বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, কোষাধ্যক্ষা এবং বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর উত্তরসূরী শ্রীমতী সনিকা চাকী। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন বিপ্লবী যতীন দাশ ট্রাস্টের সদস্য-সহ বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস, বিপ্লবী শম্ভুনাথ দত্ত, বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং বিপ্লবী মনোরঞ্জন দত্তের উত্তরসূরীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম পরিষদ, বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ কমিটির সদস্য-সহ একাধিক রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের কার্যকর্তারা। বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর অবদান ও বলিদানকে স্মরণ-মননের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বহরমপুরে পদযাত্রা

গত ১০ ডিসেম্বর দক্ষিণ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে পদযাত্রা, প্রতিবাদ সভা সহ ডেপুটেশন প্রদানের কর্মসূচি পালিত হয়। বাংলাদেশে নৃশংস হিন্দু নির্যাতন, হত্যার প্রতিবাদে এবং সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এই প্রতিবাদী কর্মসূচি নেওয়া হয়।

এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মন্দার গোস্বামী, অনুপম মৈত্র, শ্যামল মণ্ডল, মৌটুসী রায়, মলয় মহাজন, দিগেন মণ্ডল। সভা সমাপ্ত হওয়ার পর জেলা শাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গোপালী আশ্রমে হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা শিবির

গত ১০ ডিসেম্বর সালুয়ার গোপালী আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ প্রকাশ মল্লিক ও ডাঃ পার্থসারথী মল্লিক সারাদিনে মোট ৯৬ জন রোগীর নিঃশুল্ক চিকিৎসা পরামর্শ দেন। শিবিরের পরিচালনায় ছিল ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ হোমিওপ্যাথি।

ত্রিপুরার স্থপতি মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মন

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

ভারতবর্ষ অনেক মহান দার্শনিক, গাণিতিক, কবি, লেখক, মহাপুরুষ, আবিষ্কারক এবং দেশ নেতার জন্মভূমি। এমনই একজন কিংবদন্তী দূরদর্শী ও প্রগতিশীল শাসক মহারাজার নাম বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মন। যিনি একেবারে কম সময়ের জীবনে অনেক কিছু অর্জন করেছিলেন। যার কীর্তি অমর হয়ে রয়েছে পার্বত্য ত্রিপুরার সর্বত্র।

মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের পিতা মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মন বাহাদুর এবং মাতা মহারানি অরুন্ধতী মহাদেবী। যুবরাজ ছোটোবেলা থেকেই মহান বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছিলেন। তিনি পড়াশোনা ও সামরিক শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সময় রাজ্য শাসন বিষয়ে পিতাকে সহায়তা করতে শুরু করেন। তিনি শুধু মেধাবীই ছিলেন না, একজন বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড় এবং পিতার মতো একজন শিল্পীও ছিলেন। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর পর মাত্র ষোল বছর বয়সে বীর বিক্রম মাণিক্যের রাজ দায়িত্ব এসে যায়।

মেধাবী এই রাজপুত্র রাজস্থানের আজমিরের মেয়ো কলেজ এবং ইংল্যান্ডের হ্যারো স্কুল হতে শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন তিনি। যার ফলে তাঁর রাজত্বকালে ত্রিপুরায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তিনি ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বহু উন্নয়নমুখী কাজ করে গেছেন। তিনি একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারক ছিলেন অন্যদিকে ছিলেন প্রজাহিতৈষী। প্রজাকল্যাণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, শিল্প ও কারুশিল্প, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, কৃষি, বিজ্ঞান, ইতিহাস ঐতিহ্য, প্রশাসনিক দক্ষতায় মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মন ছিলেন অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও ছিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের প্রথা বিলুপ্ত করেছিলেন এবং অনুরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে জমিদারিও বিলুপ্ত করেছিলেন। সেটি যে কোনো বিচারে ছিল ঐতিহাসিক। তিনি জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও সম্মানিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজপরিবারের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মহারাজার সুসম্পর্ক ছিল আমৃত্যু। এই কবি ত্রিপুরায় এসে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন। কথিত তিনি সাতবার রাজ্যে এসেছিলেন। ত্রিপুরার রাজপরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়ছিল। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন এই ভারত ভাস্কর উপাধি তাঁর কাছে অন্যান্য উপাধির চেয়ে অন্যতম।

মহারাজা সামাজিক অগ্রগতিতে শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে প্রজাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ (এমবিবি কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। ত্রিপুরার পরিকাঠামোর উন্নতি সাধনে সড়ক, সেতু, পাবলিক বিল্ডিং, রাজ্য জুড়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেন। স্বাস্থ্যসেবার তাৎপর্য অনুধাবন করে তিনি ত্রিপুরার

মানুষের জন্য সহজলভ্য ও গুণমানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে বহু হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা একটি প্রাণবন্ত শহর যা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রের সাক্ষ্য বহন করে। শহরটির প্রশস্ত রাস্তাঘাট মহারাজার দূরদর্শিতার পরিচয় আজও বহন করে চলেছে। মহারাজা ত্রিপুরার শিল্পকলা, কারুশিল্প ও ঐতিহ্যকে পালন ও পোষণ করতেন। আগরতলার রাজবাড়ি স্থাপত্য আজকে সবার কাছে এক বিস্ময়। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, নীরমহল ও উনকোটি শিলাকাটা ভাস্কর্যের মতো ল্যান্ডমার্কগুলি রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও শৈল্পিক ঐতিহ্য। এগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে। মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প আজও ত্রিপুরার রাজ পরিবারের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। ত্রিপুরার হস্ত ও কারুশিল্প বিকশিত হয়ে আজকে বিশ্ববাজারে স্থান দখল করে নিয়েছে। ত্রিপুরার চমৎকার বাঁশ ও বেতের কারুকাজ, হাতে বোনা বস্ত্রশিল্প ও মৃৎশিল্প স্থানীয় কারিগরদের শৈল্পিক দক্ষতা রাজার উদ্যোগের মনোভাবকেই প্রদর্শন করে। এসব কারুশিল্প জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই পরিচিতি পেয়েছে।

মহারাজা ত্রিপুরায় প্রথম বিমানবন্দর (আগরতলা বিমানবন্দর) স্থাপন করেন। তিনি নাবালক থাকার সময় ত্রিপুরা তার মায়ের নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল অব রিজেন্সি দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সর্বদিক থেকে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের জন্য তিনি 'ত্রিপুরার স্থপতি' নামে আজও আমাদের কাছে সুপরিচিত। □

শিবক্ষেত্র ভদ্রেশ্বর

অর্ণব দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র ২৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হুগলি জেলার অতি প্রাচীন এক জনপদ ভদ্রেশ্বর। বিপ্রদাস পিপলাই রচিত 'মনসামঙ্গল কাব্যে' ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে বণিক চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙা ভিড়েছিল এই ভদ্রেশ্বরের ঘাটে। বঙ্গের আধুনিক ইতিহাস অনুযায়ী কোনো এক সময় ড্যানিশ অর্থাৎ ডেনমার্কের বণিকদের কুঠি ছিল এই ভদ্রেশ্বরে। তাই লোকমুখে স্থানটির প্রচলিত নাম হয় দিনেমারডাঙ্গা। দিনেমানডাঙ্গার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান বণিকরা তাদের কুঠি নির্মাণ করেছিল। সপ্তদশ শতকে ভদ্রেশ্বরকে মানুষ চিনতো ভদ্রেশ্বর গঞ্জ নামে। ভদ্রেশ্বর একসময় ছিল ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো গঞ্জ বা বাণিজ্য কেন্দ্র। সেই যুগে কালনা থেকে কলকাতার মধ্যে এত বড়ো গঞ্জ কোথাও ছিল না। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়াম উইলসন হান্টার রচিত 'আ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' -এর তৃতীয় খণ্ডে ভদ্রেশ্বর থেকে সারা বিশ্বে বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা রয়েছে। আনুমানিক ১৭২০ থেকে ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে ভদ্রেশ্বরে ঘাঁটি গেড়ে ব্যবসা শুরু করে বেলজিয়াম বা ফ্লেমিশ বণিকেরা। কয়েকবছর ব্যবসা বাণিজ্য করার পর তারা চলে যায় উত্তর ২৪ পরগনার বাঁকিবাজার অঞ্চলে। ফ্লেমিশ বণিকেরা চলে যাওয়ার পরেই ব্রিটিশরা ভদ্রেশ্বর দখল করে। ভদ্রেশ্বর রেল স্টেশন তৈরির অনেক আগেই ব্যবসা বাণিজ্যে আমদানি-রপ্তানির জন্য ভাগীরথীর তীরে গঞ্জের কাছেই নির্মিত হয় ভদ্রেশ্বর ঘাট স্টেশন ও মালগুদাম।

পরবর্তীতে ভদ্রেশ্বর রেলস্টেশন নির্মিত হয় এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পূর্ব ভারতের প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত যাত্রা শুরু করে এই ভদ্রেশ্বর রেল স্টেশনের উপর দিয়ে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই রেল লাইনটি রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইতিহাসে ভদ্রেশ্বরের আর এক নাম বুদেসি। শুধু ব্যবসা বাণিজ্যেই নয়, সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও শাস্ত্র অধ্যায়নের ক্ষেত্র হিসেবে সুনাম ছিল এই প্রাচীন জনপদটির।

বাঙ্গলার ইতিহাসের আর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে ভদ্রেশ্বর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হেন্সসম্যান অ্যান্টনি (১৭৮৬-১৮৩৬) যিনি বাঙ্গলার কবিগানের ইতিহাসে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নামে চিরস্মরণীয়। তাঁর বসতি ছিল ওই ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটিতে। অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি জন্মসূত্রে ছিলেন পর্তুগিজ, তবে তাঁর জন্ম ভারতবর্ষে।

শোনা যায় গৌরহাটির ভাগীরথী তীরে তাঁদের লবণের ব্যবসা ছিল এবং প্রথম জীবনে তিনি সেই ব্যবসা সামলেও ছিলেন তবে পরবর্তীকালে বাঙ্গলার লোকগান ও লোকসংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শুরু করেন কবিগান। বঙ্গের দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে বঙ্গের বিশিষ্ট কবিয়ালদের কবিগানের লড়াইয়ে পরাজিত করে তিনি কবিগানের জগতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। শোনা যায়,

অ্যান্টনি কবিয়াল এই গৌরহাটির ঘাট থেকে নৌকা করে কলকাতায় কবিগানের আসরে যেতেন। এই ঘাটের কাছেই ছিল তাঁর বসত বাড়ি। কোনো এক সময় ভাগীরথীর তীরে স্বামীর সহমরণে সতী হওয়া থেকে রক্ষা করে একজন ব্রাহ্মণীকে তিনি বিবাহ করেন। আরও শোনা যায় তিনি তাঁর বসত বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রতি তাঁর ভক্তির চিহ্নস্বরূপ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন এক কালীবাড়ি। পরবর্তীকালে তাঁর নাম অনুসারে সেই মন্দিরের নাম হয় ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি। ঠিক এই রকম কত শত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে আমাদের এই ঐতিহাসিক শহর ভদ্রেশ্বর, তবে আজ সেসব ইতিহাস সময়ের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে।

'ভদ্রেশ্বর' এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক সুবিশাল ইতিহাস ও জনশ্রুতি। ঐতিহাসিক এবং জনসাধারণের মতে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ শিবের নাম অনুসারে এই স্থানটির নাম হয়েছে ভদ্রেশ্বর। ভদ্রেশ্বরের স্থানমাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভদ্রেশ্বর বারাণসী তুল্য 'দ্বিতীয় কাশীধাম'। ভৌগোলিকভাবে ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ে কাশী অবস্থিত ঠিক তেমনি ভাগীরথী-গঙ্গার পূর্ব পাড় কাশী সমতুল্য। তাই জনশ্রুতি অনুসারে ভদ্রেশ্বর 'বঙ্গদেশের দ্বিতীয় কাশী' নামে অভিহিত। শোনা যায়, বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ স্বয়ম্ভু এবং শৈবতীর্থ তারকেশ্বরের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হতে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ পূজিত হয়ে চলেছেন। জনশ্রুতি, ত্রেতা যুগে যুগাবতার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে এই স্থানে স্বয়ম্ভু মহাদেব বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের উপাসনা করছিলেন। তারপর বহু যুগ ধরে ভাগীরথীর তীরে গোপনে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ অবস্থান করেন এক মাটির ঢিবির মধ্যে। আনুমানিক ৮০০ বছর আগে এই স্থান ছিল পাট ও হোগলায় ভরা জঙ্গলাকীর্ণ এক নদীর পার। একটা গোয়ালা একদিন দেখতে পায় একটি গাভী একটা মাটির ঢিবির উপর অনর্গল দুগ্ধ বর্ষণ করে চলেছে। তাঁর মনে কৌতুহলে তিনি সেই স্থানের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আবিষ্কার করেন প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ। আরও দেখেন শিবলিঙ্গের মাথায় এক মহামূল্যবান মানিক। লোভের বশবর্তী হয়ে সেই গোয়ালা শাবলের আঘাতের সেই মানিক শিবলিঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নৌকায় পার হয়ে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো কারণবশত সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তীতে সেই স্থানের নাম হয় মানিকনগর ঘাট ও মহাশ্মশান। আবার আর একটি জনশ্রুতি অনুসারে কিছু ব্যক্তি ভাগীরথীর পার্শ্ববর্তী স্থানের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে দেখতে পান এক শিবলিঙ্গ। মাটি খোঁড়ার সময় তাদেরই কারুর শাবলের আঘাতে শিবলিঙ্গের মাথায় এক বিশাল ফাটল সৃষ্টি হয়। সেই প্রকাণ্ড ফাটল আজও বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মস্তকে বিদ্যমান। পরবর্তীকালে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের আবির্ভাবের খবর পেয়ে বর্ধমানের রাজা (রাজার নামটি অজানা) সেই স্থানে আসেন এবং খনন কাজ চালিয়ে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথকে বর্ধমানে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তবে দীর্ঘ খনন কাজের পর শিবলিঙ্গের আদি অন্ত কিছু না পেয়ে বর্ধমানে রাজা ওই স্থানেই শনপাট ও হোগলার বন পরিষ্কার করে একটি ছোটো মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের নামে প্রচুর পরিমাণে জমি দেবোত্তর করে দেন। বাবার নিত্য সেবা, পূজার জন্য নিযুক্ত করেন মিশ্র পরিবারের ব্রাহ্মণদের। তারা আজও বংশপরম্পরায় বাবার নিত্য সেবা পূজা করে চলেছেন। আরও তিন পরিবার যথা— মালাকার পরিবার (যাদের ফুল, বেলপাতা ও মালায় বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ আজও সেবিত হন), পাঠক পরিবার (বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দির নিকটবর্তী মা অন্নপূর্ণার বংশানুক্রমিক সেবাইত) এবং ভট্টাচার্য পরিবারদের কিছু জমি দান করে বর্ধমানে ফিরে যান।

তৎকালীন সময়ে আজকের হুগলি কিংবা হাওড়া জেলার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, স্থানগুলি সম্পূর্ণ ছিল বর্ধমান রাজ্যের অধিনস্ত সামন্ত ও জমিদার শাসিত ছোটো ছোটো নগর কিংবা গ্রাম।

পরবর্তীকালে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনাধীন বর্ধমান থেকে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় হুগলি জেলা। তারও ঠিক কিছু বছর পর ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন হুগলি জেলার দক্ষিণ অংশটি ভাগ হয়ে তৈরি হয়। হাওড়া জেলা এবং শেষে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে হুগলি জেলার দক্ষিণ- পশ্চিমের কিছু অংশ তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের হুগলি জেলার এই বিভাগের আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামটি হুগলি জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম ছিল। বর্ধমান রাজের বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠার বহুকাল পর সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন পেরিয়ে মন্দির জীর্ণ হয়ে পড়লে তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কোনো এক সদস্য মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দিরের পিছন দিকের বিস্তীর্ণ জমির উপর প্রতিষ্ঠা করেন মা অন্নপূর্ণার সুন্দর একটি মন্দির। সেই মন্দিরে মা অন্নপূর্ণা আজও বালিকারূপে পূজিতা হয়ে চলেছেন। বারাণসীর বাবা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের মতো বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ ও মা অন্নপূর্ণার মন্দির বিদ্যমান হওয়ায় স্থানটির লোকমুখে দ্বিতীয় বারাণসী তীর্থে পরিণত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের সেবার কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হলে ভদ্রেশ্বরের ধনী ব্যবসায়ী শ্যামসুন্দর মণ্ডলের নিঃসন্তান বিধবা কন্যা শ্রীমতী সখীবালা দাসী মন্দির মেরামত করিয়ে সুন্দরভাবে বাবার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন।

বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মহিমা বিষয়ক বিশেষ কিছু জনশ্রুতি আছে, যেমন কোনো এক সময় ভদ্রেশ্বর অঞ্চলে 'মারিঙ্গা' বলে একটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হতে শুরু করে। তখন বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ তাঁর সেবাইতকে স্বপ্ন দিয়ে ওষুধের সন্ধান দেন। বাবার স্বপ্নে দেওয়া সেই ওষুধের প্রভাবে মারিঙ্গা নামক ব্যধি থেকে চিরতরে মুক্তি পেয়ে সকলে আরোগ্য লাভ করে। ঠিক এমনিভাবে বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের মন্দিরের একজন সেবিকা রানু দাস বাবার আদেশে স্বপ্নে অর্শ নামক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির ওষুধ পান। সেই ওষুধের প্রভাবে অগণিত মানুষ শারীরিক যন্ত্রণা হতে মুক্তি পান। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, প্রতিদিন ভোরবেলা বাবা ভদ্রেশ্বরনাথ খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা স্নানে যান। কেউ কেউ বাবার খড়মের সেই শব্দ পেয়েছেন এবং এক দিব্য অনুভূতি লাভ করেছেন। এই শৈবক্ষেত্র ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দারা বাবা ভদ্রেশ্বরনাথকে কেন্দ্র করে নানারকম উৎসবে মেতে উঠতেন, তার মধ্যে শিবরাত্রি, নীল পূজা, শ্রাবণ উৎসব, চৈত্রের চরক-গাজন ও এক মাস ব্যাপী সন্ন্যাস উৎসব।

শোনো যায়, বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করা নাকি বড়ো কঠিন। সেই কঠোরতা অবলম্বন করে শত শত ভক্ত এক মাস ব্যাপী সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন এবং গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষার উদ্দেশে উদাত্ত কণ্ঠে বলতেন, 'বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের চরণে সেবা লাগে মহাদেব...' শুধু ভদ্রেশ্বরের আনাচে কানাচে নয়, ভদ্রেশ্বর ছাড়িয়ে একসময় কলকাতা তথা বঙ্গের বহু স্থানে এমন বোল শোনা যেত, তবে আজ সবই ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। জনশ্রুতি, বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের দর্শনে এসেছে বহু মহামানব ও সাধক। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাশীর জীবন্ত শিব তৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ গিরি (যিনি পরবর্তীকালে ভদ্রেশ্বরের গঙ্গার ঘাটের কাছে তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই আশ্রম আজ অভেদানন্দ আশ্রম নামে পরিচিত)। নামময় অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর (গঙ্গা নিকটবর্তী তাঁর আশ্রমে আজও অহরহ শ্রীহরিনাম সংকীর্তন হয়ে চলেছে) প্রভৃতি বহু সাধু, সন্ন্যাসী ও মহান ব্যক্তিবর্গ।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' কিংবা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'চাঁদের পাহাড়ে' ভদ্রেশ্বর তথা বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এত জনশ্রুতি মিশ্রিত ইতিহাসের আলোচনার পরও কবিগুরুর ভাষায় সেই আক্ষেপ প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

সত্যই আমরা বহু অর্থ ও শক্তি ব্যয় করে কত কত স্থান দেখতে যাই অথচ আমাদের আশেপাশে যে কত ইতিহাসের অমূল্য মণিমানিক্য পড়ে আছে তা আমরা নিজেরাই জানি না, খবরও রাখি না। এই ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখতে হলে আসতে হবে ভদ্রেশ্বর। হাওড়া থেকে হাওড়া- ব্যান্ডেল, হাওড়া-বর্ধমান কিংবা হাওড়া-কাটোয়া লোকাল ধরে দ্বাদশতম স্টেশন ভদ্রেশ্বর আর যদি শিয়ালদহ হয়ে শ্যামনগর স্টেশনে নেমে গঙ্গার ঘাট পার হলেই এপারে তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর।

ভদ্রেশ্বর বাবা ভদ্রেশ্বরনাথের নাম অনুসারে হলেও ভদ্রেশ্বরতলার ভদ্রেশ্বরনাথ মন্দির ছাড়াও তেলিনীপাড়ার মা অন্নপূর্ণার মন্দির, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা অন্নপূর্ণার রথযাত্রা, বিশ্ব বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পূজা বিশেষ করে সকল বারোয়ারি পুজা-সহ গৌড়হাটি তেঁতুলতলার এবং ভদ্রেশ্বর গঞ্জের জগদ্ধাত্রী পূজা, ভলিবল খেলা ইত্যাদির জন্য ভদ্রেশ্বর সুবিখ্যাত। জলভরা সন্দেশের আবিষ্কারও এই ভদ্রেশ্বরে। চন্দননগরের জলভরা সন্দেশ খাননি এমন মানুষ নেই। তবে এই সন্দেশের আবিষ্কারের। ইতিহাসের সঙ্গে যে ভদ্রেশ্বরের তেলিনীপাড়ার জমিদার বাড়ি যুক্ত আছে সেটা অনেকেরই জানা নেই। দিনটি ছিল জামাইষষ্ঠী। বাড়ির গিন্নিমার ইচ্ছা হলো প্রথমবার তাঁর জামাই শ্বশুরবাড়ি আসছে, তাই এমন একটা মিষ্টি খাওয়াবেন যেন জামাই ঠকে যায়। ঠিক যেমন ভাবা অমনি কাজ। জমিদার বাড়িতে ডাক পড়লো সূর্যকুমার মোদকের। গিন্নিমা সবকিছু বুঝিয়ে দিতেই সূর্যকুমার মোদক তালশাঁসের আকারে তৈরি করে ফেললেন বিশ্ববিখ্যাত জলভরা সন্দেশ।

ঠিক এইভাবেই সুখে-দুঃখে-উত্থান-পতনে আপামর ভদ্রেশ্বরবাসী তাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ঠিক একইভাবে ইতিহাসের ধারা বহন করে নিয়ে যাবে। □

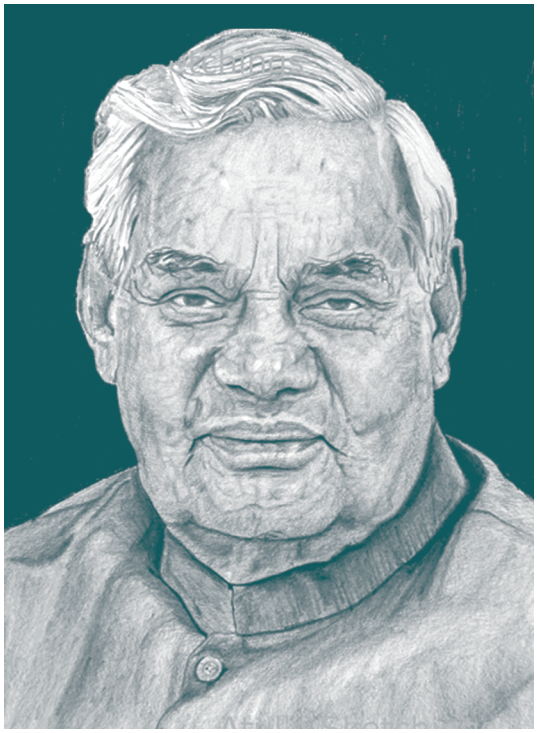

‘আমি এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখি যেটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও যত্নশীল। এমন একটি ভারত, যা মহান জাতির সমাজে সম্মানের স্থান ফিরে পায়।’

পঁচিশ ডিসেম্বর—এক রাষ্ট্রনায়কের জন্মদিন

দেবজিৎ সরকার

‘কালকে কপাল পর লিখতা মিটাতা হুঁ, গীত নয়া গাতা হুঁ’— কে বলতে পারেন এত বড়ো কথা? সবথেকে বড়ো কথা, যে সময় বক্তা একথা বলছেন সেই সময় ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে দাঁড়িয়ে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে একথা বলতে পারেন। শুধু বলছেন না, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে করেও দেখাচ্ছেন।

স্রোতের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে তৎকালীন কংগ্রেসের ক্ষমতামোহের দিকে না তাকিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আহ্বানে নীতি, আদর্শ, বিচারধারাকে সামনে রেখে, জ্বলন্ত প্রদীপের অকম্প শিখাকে পাথেয় করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন, সংগঠন তৈরি করছেন। রাজনৈতিক গুরু ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুর পর সংগঠনকে পথ দেখাচ্ছেন; সর্বোপরি নিজেকে এমন এক সর্বগ্রাহ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে একটু একটু করে মেলে ধরছেন যা পরে অনন্য সাধারণ হিসেবে শুধু ভারতবাসী নয় বিশ্ববাসীর সামনে এসে দাঁড়াবে।

সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে কালো বা বাদামি চামড়ার সাহেবদের দেশে দেশের আইনসভায় ইংরেজিতে নয়, বক্তব্য রাখছেন শুদ্ধ হিন্দিতে। বলছেন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা, বলেছেন সনাতন ভারতের বিভিন্ন রাজামহারাজার উপাখ্যান। বক্তব্যের মাঝে বারবার তুলে ধরতেন অসামান্য রসবোধ যা পক্ষ ও বিপক্ষের মাঝে থাকা লক্ষ্মণরেখাকে কখনো অতিক্রম করেনি।

শুধু দেশের আইনসভা নয়, বক্তব্য রাখছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে। ইংরেজিতে সাহেবদের মতো করে বলে সাহেবদের বোঝানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছেন না। বলছেন তাঁর মাতৃভাষায়, সরাসরি এবং বুঝিয়ে ছাড়ছেন। সম্মান ও সম্ভ্রম দুটোই আদায় করে নিচ্ছেন সাদা চামড়ার ইউরোসেন্ট্রিক মানসিকতার মানুষগুলোর কাছ থেকে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে, বিরোধীর সদস্য হিসেবে মন জয় করে নিচ্ছেন শাসক গোষ্ঠীর দলে তিনি যখন দাঁড়াচ্ছেন, কথা বলছেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ।

শুধু কি রাজনৈতিক জীবনে? ব্যক্তি পরিসরে এবং ব্যক্তিগতস্তরেও জীবনের প্রতিটি বাঁকে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী। আমরা কি মনে করতে পারবো যে পিতা-পুত্র একই কলেজের একই ক্লাসে বসে একই অধ্যাপকের ভাষণ শুনছেন, ক্লাস নোট নিচ্ছেন ভাগাভাগি করে, একসঙ্গে পাশ করছেন, ডিগ্রি পাচ্ছেন? এরকম ঘটনা কি বিরল থেকে বিরলতম মধ্যে পড়ে না? হ্যাঁ, অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর পিতার সঙ্গে একই কলেজে একই ক্লাসে পড়তেন।

ব্যতিক্রমী এই ব্যক্তিত্ব ক্রমান্বয়ে এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কালে যে জগদ্দল শাসন ব্যবস্থা তাকে পরিবর্তন করার সব

ফ ঃ ৫

রকম প্রয়াস করে গেছেন। প্রথমত, ঘরে ঘরে মোবাইল ফোনের চিন্তা প্রথম করেছিলেন তিনিই, করেও দেখিয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্তরে যে পলিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড বস্তুটি থাকা উচিত তা বারবার প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ভারতবাসীর কাছে যে চারটি মহারাজপথ সারা ভারতবর্ষকে জড়িয়ে ধরে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সচল করে তুলেছে, বর্তমানে সেই স্বর্ণালি চতুর্ভুজ যোজনার জন্য ভারতবাসী অটলজীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

নরম হাসিখুশি মানুষটি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন— পোখরান-২ পরমাণু বিস্ফোরণের পর সারা বিশ্বের চোখ রাঙানিকে চোখে চোখ রেখে প্রতিহত করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সেই হটলাইনে হুমকি— ভারত যদি পরমাণু বিস্ফোরণের পরীক্ষা করে এবং ওই ধরনের পরীক্ষা যদি বন্ধ না করে তাহলে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করতে পারে। দৃপ্তকণ্ঠে হট লাইনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, পাকিস্তানের কাছে যে পরিমাণ পরমাণু অস্ত্র আছে, তাই দিয়ে ভারতের বুকে তারা আঘাত হানতেই পারে।

কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন পাকিস্তান নামক দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে আর থাকবে না। হ্যাঁ, ইনিই অটলবিহারী বাজপেয়ী যিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারেন 'আমি অটলবিহারী— অটলও আমি; বিহারীও আমি।'

ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর স্ফুরণ ভারতের মানুষ দেখলো ১৯৯৬ সালের মে মাসে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সংসদে তাঁর বিদায়ী ভাষণ রাখছেন। যখন শুরু হয়েছিল ভাষণ, তখন একই সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন সংসদের সবাই। সেদিন যেন অটলবিহারী বাজপেয়ী অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে নির্গত প্রতিটি শব্দ এবং তাঁর শরীরীভাষ্য যেন বিরোধীদের বিভিন্ন আক্রমণকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সারা দেশ লোকসভা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত সেই অনবদ্য ভাষণ শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সময় বিজেপি ছিল সরকারে ক্ষমতাসীন। অর্থ প্রয়োগের মাধ্যমে ওই এক ভোটে যে সরকার পড়ে যাবার দুর্ঘটনা তাকে আটকাতেই পারতেন। কিন্তু তিনি সেদিন সেই চেষ্টা করেননি। বিন্দুমাত্র আমল দেননি যেন তেন প্রকারেণ সরকার টিকিয়ে রাখার। উচ্চারণ করলেন রামায়ণ থেকে— 'ন ভীত মরণাতদস্মি কেবলং দূষিতো যশঃ।' আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, অপযশকে ভয় পাই। আমি ক্ষমতার জন্য অন্য দল থেকে সদস্য ভাঙিয়ে নিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখবো না।

সারা দেশের মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন, 'সত্তাকা খেল তো চলেগা, সরকারেঁ আয়েগী জায়েগী, পার্টিয়া বনেগি বিগড়েগি, মগর ইয়ে দেশ রহনা চাহিয়ে, ইসকা লোকতন্ত্র অমর রহনা চাহিয়ে।'

রামমন্দির আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক, তার আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের দায়িত্ব, তারপরে হিন্দুরাষ্ট্র দলের সর্বভারতীয় দায়িত্ব এবং ১৯৫৫ সাল থেকে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সান্নিধ্য। এছাড়াও জনতা পার্টিতে জনসঙ্ঘকে বিলীন করা এবং তারপরে বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি স্থাপন করা। পুরো বিষয়টি অটলবিহারী বাজপেয়ী তার সময়কালে সম্পন্ন করেছেন। সোজা কথা সোজাভাবে বলা হিপোক্রেসি না করে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া— এটাই অটলবিহারী বাজপেয়ীর ধর্ম। কাজের প্রকৃতি অদ্ভুত। সব ঘটনা যা আলোচনা করা, তার সময়সারণিতে আরও চিন্তার ব্যাপার। সোজা কথা সোজাভাবে বলা এবং সেই মতো জীবন পরিচালনা করা— ইনিই অটলবিহারী বাজপেয়ী। যারা অটলবিহারীকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ধারক হিসেবে দেখাতে চান এবং তুলনামূলকভাবে কম কট্টরবাদী দেখিয়ে নিজেদের বোদ্ধা মনে করেন, তাদের উত্তরের জন্য অটলবিহারী লিখেছিলেন তার বিখ্যাত কবিতা— 'হিন্দু তনমন হিন্দু জীবন রগ রগ হিন্দু, মেরা পরিচয়।'

১৯৩৯ সালের ১৬ বছরের যে ছেলেটি বাবাসাহেব আপ্তের সংস্পর্শে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যাঁর ব্রিটিশ ভারতে জেলযাত্রা হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে সেই ছেলেটি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব পান। সঙ্ঘের যোজনায় ১৯৫১ সালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘের কর্মী হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পান। ১৯৫৭ সালে বলরামপুর থেকে জিতে লোকসভার সদস্য হওয়ার পর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব, ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ এবং অন্যান্য নানাবিধ পদ, ক্ষমতা ও যশপ্রাপ্তির পরও নিজের ব্যতিক্রমী চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনো পিছু হটেননি। প্রখরভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর ব্যক্তিগত জীবন, বান্ধবী রাজকুমারী কউল ও তাঁর কন্যার সঙ্গে এক ছাদের নীচে বসবাস ও খাদ্যাভ্যাস— কোনো প্রশ্নেই তিনি কারও কাছে মাথা নোয়াননি। লোকসভা ভোটে সারাদেশে শোচনীয় হারের পরেও তিনিই স্বচ্ছন্দে কর্মীদের ভরসা দিতে পারেন— আবার সকাল হবে।' বলতে পারেন— 'অন্ধেরা ছটেগা, সুরজ নিকলেগা, কমল খিলেগা'।

হিপোক্রেসিপূর্ণ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন যুক্তিবাদী আধুনিক হিন্দুত্বের পোস্টার বয়, যিনি তাঁর নিজের দল ও বাইরের বহু মানুষের কাছে অনুকরণযোগ্য নায়কোচিত চরিত্র— 'আমি এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখি যেটি সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও যত্নশীল। এমন একটি ভারত, যা মহান জাতির সমাজে সম্মানের স্থান ফিরে পায়।' তাঁর জন্মদিন ২৫ ডিসেম্বরকে ভারত সরকার সুশাসন দিবস হিসেবে ঘোষনা করেছে। এই দিনে প্রার্থনা— তাঁর স্বপ্নের স্পর্শে ভবিষ্যৎ ভারতের কল্পরূপ বিকশিত হোক, ভারত বিশ্বগুরুর স্থান অর্জন করুক। □

সময় যত গড়াচ্ছে, হিন্দুর ওপর অত্যাচার তত তীব্র হচ্ছে

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশের হিন্দুরা এখন কঠিন সময় পার করছে। এর মানে এই নয় যে তাঁরা আগে খুব ভালো সময়ে ছিলেন। তবে এখনকার সময়টা বড্ডো কঠিন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৩ বছর, এই পুরো সময়টাই হিন্দুরা কম-বেশি নির্যাতিত হয়েছে এবং এটি সব সরকারের আমলে। সময় যত গড়াচ্ছে, অত্যাচারের রোলার ততই তীব্র হচ্ছে। এ সময়ে পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর এতদঞ্চলে হিন্দুদের ভোগান্তি শুরু। এই অঞ্চলের হিন্দুরা একটি উপেক্ষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠী হয়েই থেকে গিয়েছে।

কথায় বলে, বাঙ্গালি হিন্দু আত্মভোলা জাতি। বর্তমান সময়ে নির্যাতনে এঁরা চিৎকার করছে। সদ্য অতীতে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগের আমলের চরম নির্যাতনের কথা ভুলে গেছে। খালেদা জিয়া ও বিএনপি আমলের নির্যাতনের কথা এদের স্মরণে নেই। রামমন্দির ইস্যুতে সন্ত্রাস, এরশাদ-জিয়ার আমলে নির্যাতন কিছু এদের মনে নেই। এমনকী নোয়াখালি নরহত্যা, খুলনায় জেহাদি সন্ত্রাস, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ বা বরিশালে ভয়াবহ হিন্দু হত্যার কাহিনি বেমালুম ভুলে বসে আছে।

২০২৪-এ হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দুর ওপর জেহাদি সন্ত্রাস তীব্র হয়েছে, এটি সত্য। এটিও সত্য যে, এই প্রথম বাংলাদেশের হিন্দুরা প্রতিবাদী হয়েছেন, রাস্তায় নেমেছেন, রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি ছেড়ে ধর্মীয় পরিচয়ে মাঠে নেমেছেন। এটি শুভ লক্ষণ। অন্ধকার তীব্র হলে আলোর ঝলকানি দেখা যায়, রাত গভীর হলেই ভোরের সূর্যোদয় হয়। হিন্দু জাগছে, জেগেছে। সামনের দিনগুলোতে হিন্দুদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। হিন্দু মরতে মরতে বাঁচতে শিখেছে, তাই নতুন করে বাঁচার সাহস অর্জন করেছে।

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী হিন্দু জাগছে। দীর্ঘকাল হিন্দু ঘুমিয়ে ছিল। খরগোশ ঘুমিয়ে ছিল বলেই কচ্ছপ রেসে জিতেছিল। হিন্দু সজাগ থাকলে অন্যরা সন্ত্রাস করবে সাধ্য কার? দীর্ঘকাল পর ঘুম ভেঙে হিন্দু নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে যে, তাদের একটি চমৎকার ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা আছে। নতুন করে শোনা যাচ্ছে— 'কুরুক্ষেত্রের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আর একবার'। বাকি বিশ্ব যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ভারতবর্ষে বৈদিক সভ্যতার আলো তখন বিশ্বকে আলো দেখিয়েছিল।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা এখন সমগ্র বিশ্ব জানে। এই প্রথম ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ কথা বলছে। মমতা ব্যানার্জির মতো কট্টর হিন্দু-বিরোধী নেত্রীও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, দিল্লির উচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে দরবার করে বাংলাদেশে হিন্দুদের রক্ষায় 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী' পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে। তার কথাকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশ এ সময়ে একটি জেহাদি দেশ। সংখ্যালঘুর ওপর জেহাদি সন্ত্রাস বন্ধের উপায় বিশ্ব এখন ভাবছে।

সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই মতামত দিচ্ছেন। হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়লে কথা আরও উঠবে। জিন্না বলেছিলেন, হিন্দুদের সঙ্গে থাকা যায় না। এখনকার পরিস্থিতি তখনকার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ। হিন্দুরাও এখন ভাবছে, ওইসব জেহাদি মুসলমানের সঙ্গে কি থাকা যাবে? কেউ কেউ সংখ্যালঘু নিরাপত্তা জোনের কথা বলছেন। অন্যরা ১৯৪৭-এ 'জনসংখ্যা বিনিময়' না হওয়ার বিষয়টি সামনে আনতে চাইছেন। বাংলাদেশকে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে হবে, নইলে সমস্যা বাড়বে তা বলা বাহুল্য। □

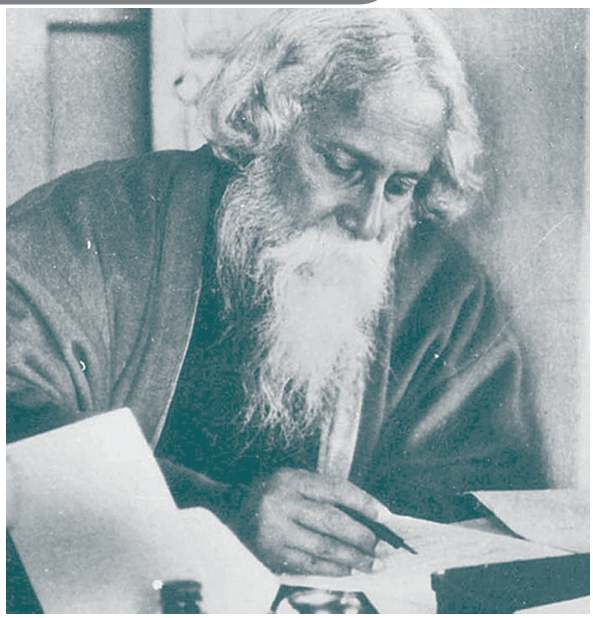

বঙ্গের সমবায় ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সাফল্য ও অবদানের পাশাপাশি তিনি একজন অনুকরণীয় বরেণ্য সমবায় মানসিকতার মানুষ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপ তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমবায় নিয়ে যে আগ্রহ উদ্দীপনা ও প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছিল ভারত তথা বঙ্গদেশেও তার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের হাত ধরে বঙ্গে প্রথম সমবায় সমিতি নিবন্ধীকৃত হয়েছিল ১৯০৫ সালের ১২ মে।

সমবায় হলো সাম্যের নীতি। স্বাবলম্বনের নীতি। আর্থিক স্বনির্ভরতার দিশা যা রবীন্দ্রনাথকেও গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সমবায় বলতে কী বুঝি, তা একটু দেখা যাক। তা হলো নিজেদের আর্থিক কল্যাণ সাধনের জন্য কতিপয় সমমনস্ক ও সমশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে মূলধন সরবরাহ করে সমধিকারের ভিত্তিতে দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার ডায়েরি' থেকে জানা যায় যে তিনি পাশ্চাত্যের মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থান, শ্রম ও উৎপাদনের অংশদারিত্ব এবং সঙ্ঘবদ্ধ অর্থনৈতিক দিশা দেখে নিজের দেশে তা আনতে এবং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনার কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় সাধারণ কৃষকদের দুর্দশা কবিকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের জন্য পীড়া তিনি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'এইসব মূঢ় ম্লান মূক দিতে হবে ভাষা
এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা,
ডাকিয়া বলতে হবে মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।'

কবি স্বচক্ষে কৃষকদের চরম দারিদ্র্য, দুর্দশা দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন। এই সমস্যা উপশমের জন্য তিনি একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সে সময়ে পাতিসরের কৃষকদের বিপদ ছিল মহাজনের শোষণ। এতে তারা সর্বস্বান্ত হতে বসেছিল। এজন্যই তিনি পাতিসরে একটি কৃষিব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগে নিয়েছিলেন। মূলধনের অভাবে ব্যাংক তখন ঠিকভাবে ঋণ-দাদন দিতে পারছিল না। সেই সময় নিজের নোবেল পুরস্কারের অর্থের ১,০৮,০০০/- টাকা তিনি কৃষি ব্যাংকে রাখলেন। অবশ্য কৃষকরা ঠিকমতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অনাদায় কৃত ঋণের দায়ে এই ব্যাংক একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তিনি কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের উন্নত প্রযুক্তিতে চাষ করার প্রেরণা দিতেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা অর্জনের জন্য। রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে উন্নতমানের টমেটো ও আলুর বীজ এনেছিলেন। উন্নত প্রযুক্তির উদ্দেশ্যে পাতিসরে একটি ট্রাকটার এনেছিলেন। যা কৃষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল।

সমবায়কে সর্বস্পর্শী করে তোলার জন্য আলোচনাভিত্তিক পল্লীজীবন গঠনের দিশা দেখিয়েছিলেন। কবির দৃষ্টিতে আর্থিক স্বনির্ভরতা ব্যতীত স্বাধীনতা খর্ব ও অধরা থেকে যাবে। আর্থিক স্বনির্ভরতা সরকারের হাত ধরে আসে না, এর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে সম্ভব। কবির কাছে 'সমবায়' হলো হিংসা, বলপ্রয়োগ বা কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বিকল্প। কবির কাছে আর্থিক অসাম্য থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মারামারি করে নয়; খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের মাধ্যমে। সমন্বয়ের শক্তিই মানুষের প্রকৃত সাম্যের শক্তি। কবির ভাষায়— 'মানুষ খাটো হয় কোথায়, যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পর মিলিয়া যে মানুষ, সেই মানুষ পুরা একলা মানুষ টুকরা মাত্র।'

কবি সমবায় সম্পর্কে যে দিশা দিয়েছেন তা আজকের দিনেও কতটা প্রাসঙ্গিক তার স্মরণ ও মনন প্রয়োজন। দেশকে গড়ে তুলতে মানুষকে মানুষ হিসেবে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এজন্য প্রতি পদক্ষেপে দৃঢ়তা, ধৈর্য ও সংকল্পের প্রয়োজন— 'দৃঢ় সংকল্প'—।কবির কথা দিয়েই এই নিবন্ধের ইতি টানা যাক— 'দেশকে জয় করে নিতে হবে, পরের হাত থেকে নয়, নিজের নৈষ্কর্ম থেকে ঔদাসীন্য থেকে। ভিক্ষা করিয়া আমরা সব পাইতে পারি। কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। কারণ ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরতার ফল স্থায়ী।

বিশ্ব দাবায় বিশ্বসেরা গুকেশ ডি

নিলয় সামন্ত

নিজের মেন্টরকেই পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন শিষ্য। হ্যাঁ, এমনই ঘটনা ঘটেছে ভারতীয় দাবাতে। ১৭ বছরের দাবাড়ু গুকেশ ডি এবার টপকে গেলেন তাঁর মেন্টর বিশ্বনাথন আনন্দকে। সেই সঙ্গে তিনি ভেঙে দিলেন আনন্দের ৩৬ বছরের রেকর্ড। বর্তমানে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু গুকেশ ডি। যা দেখে বেশ অবাক হয়েছে ভারতীয় ক্রীড়া মহল। গুকেশ নিজের মেন্টরকে ছাপিয়ে ভারতীয় দাবা মহলে শোরগোল ফেলে দিলেন বলা চলে। সরকারিভাবে আনন্দকে টপকে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হয়ে গেলেন গুকেশ। আর মাত্র ১৭ বছর বয়সেই এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। বর্তমান সময়ে কম বয়সি ভারতীয় দাবাড়ুরা বেশ ভালোভাবেই উঠে আসছেন। বাকুতে অনুষ্ঠিত ফিড চেস বিশ্বকাপের তৃতীয় রাউন্ডে যোগ্যতা অর্জন করার পরই ভিশির রেকর্ড ভেঙে দেন ১৭ বছরের গুকেশ। মিসরাতদিন ইস্কান্দারোভকে হারিয়ে ২৭৫৫.৯ লাইভ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট অর্জন করেন গুকেশ।

প্রায় ৪০ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে ভারতীয় দাবার মুখ ছিলেন কিংবদন্তী বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারতকে একাধিক সাফল্য এনে দিয়েছেন তিনি। সেই বিশ্বনাথান আনন্দ জমানার দীর্ঘ ৩৭ বছর বাদে অবসান ঘটল। ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হিসেবে দীর্ঘ সময় থাকার পরে এবার আনন্দকে সরিয়ে সেই জায়গা দখল করলেন ১৭ বছর বয়সি গ্রান্ডমাস্টার ডি গুকেশ।

২০২৩ সালে গুকেশ তাঁর পারফরম্যান্সে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। চলতি বছরই দাবা র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম ১০০-র মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। ফিডের মাসিক তালিকার উপর ভিত্তি করে তাঁর বর্তমান বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং হলো ১১। এটি লাইভ রেটিংগুলির থেকে আলাদা। ম্যাচের শেষে নির্ধারন করা হয়। গত জুলাই মাসের শুরুতে গুকেশ সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে ২৭৫০ পয়েন্টের মার্ক ছুঁয়ে ফেলেন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন, যিনি ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ছিলেন তাঁর রেকর্ডও অতিক্রম করেছেন।

কার্লসেনের বর্তমান লাইভ রেটিং হলো ২৮৩৮.৪। তাঁর পিছনে রয়েছেন আমেরিকার ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা (২৭৮৬.৪)। এছাড়াও কয়েক সপ্তাহ আগেই এই গুকেশ হারিয়েছেন পাঁচবারের গ্র্যান্ডমাস্টার এবং তাঁর মেন্টর বিশ্বনাথন আনন্দকে। তখন থেকেই শোরগোল ফেলে দেন এই তরুণ দাবাড়ু। এবার নিজের মেন্টরকে টপকে গেলেন তিনি। বর্তমানে দেশের এক নম্বর দাবাড়ু তিনি।

সরকারিভাবে আনন্দকে টপকে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু হয়ে গেলেন গুকেশ। আর মাত্র ১৭ বছর বয়সেই এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। বর্তমান সময়ে কম বয়সি ভারতীয় দাবাড়ুরা বেশ ভালোভাবেই উঠে আসছেন। কয়েকদিন আগেই বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও অল্পের জন্য শিরোপা জয় সম্ভব হয়নি রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর। ম্যাগনাস কার্লসেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় নবীন তারকা পরপর দুটি গেম ড্র করেন। তবে টাইব্রেকারে হারতে হয় তাঁকে। নবীন দাবাড়ুদের এই উত্থান নিঃসন্দেহে ভারতীয় দাবার জন্য সুখবর তো বটেই।

২৭৫৫.৯ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন গুকেশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আনন্দ। তাঁর সংগ্রহ ২৭৫৪.০। বিদিত গুজরাতি ২৭১৯.৪ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। পেন্তালা হরিকৃষ্ণ ২৭১১.১ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। তাঁর র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট ২৭০৯.৯। সেই ধারা যেন বজায় রেখেই গুকেশ ডি এবার ভারতীয়দের এক নম্বর দাবাড়ু হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এই মুহূর্তে গুকেশ ডি'র ঝুলিতে রয়েছে ২৭৫৮ পয়েন্ট। বিশ্ব ক্রমতালিকায় তিনি রয়েছেন অষ্টম স্থানে। আর অন্যদিকে বিশ্বনাথন আনন্দ রয়েছেন নবম স্থানে। তাঁর পয়েন্ট ২৭৫৪।

প্রসঙ্গত, দাবা বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে আজারবাইজানের মিসরাতদিন ইসকান্দারোভকে হারানোর পরেই গুকেশের প্রথম দশে আসা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ফিডে জানিয়েছিল, আনন্দকে টপকানোর সম্ভাবনা প্রবল গুকেশের। আর বাস্তবে ঘটলও তাই। ১৯৮৬-এর জুলাই থেকে ভারতের এক নম্বর দাবাড়ু ছিলেন আনন্দ। সদ্য প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিঙে তাঁকে টপকে গিয়েছেন গুকেশ। সম্প্রতি দাবা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে হেরে যান গুকেশ। তখনই কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে আনন্দকে টপকে তিনি এক নম্বর হয়ে যাবেন। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে তিন ধাপ এগিয়ে গুকেশ বিশ্বের আট নম্বরে উঠে এসেছেন। প্রথমবার ফিডে র‍্যাঙ্কিঙে প্রথম দশে এলেন তিনি। প্রজ্ঞানন্দেরও র‍্যাঙ্কিঙে উন্নতি হয়েছে। ২৭২৭ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি বিশ্বের ১৯ নম্বরে উঠে এসেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি তৃতীয়। এই মুহূর্তে প্রথম ৩০-এর মধ্যে পাঁচজন ভারতীয় দাবাড়ু রয়েছেন। গুকেশ, আনন্দ, প্রজ্ঞানন্দের ছাড়া ও রয়েছেন বিদিত গুজরাতি (২৭ নম্বর) এবং অর্জুন এরিগেসি (২৯ নম্বর)। পি হরিকৃষ্ণ রয়েছেন ৩১ নম্বরে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঝগড়া

মানুষের শরীরে অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। সেগুলি সবাই নিজের নিজের কাজ করে। এগুলি হলো— হাত, পা, মুখ, নাক, ঠোঁট, জিভ, দাঁত, বুক, পেট, মাথা ইত্যাদি। এরা সবাই নিজের নিজের কাজ করে। যেমন, পা অন্যস্থানে যেতে সাহায্য করে। নাক শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করে। পেট খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করে ইত্যাদি।

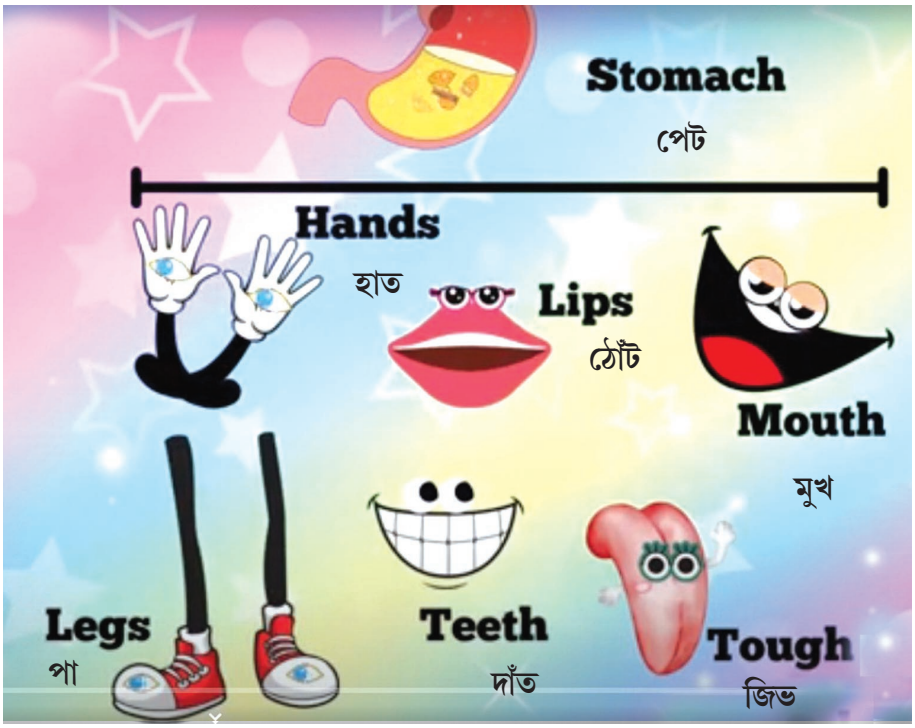

এরা একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তারা দিন রাত কাজ করে কিন্তু পেট কোনো কাজ করে না। সে শুধু বসে বসে বিশ্রাম নেয়। হাত, পা সকলে ভেবে ঠিক করল, তারা আর পেটের সেবা করবে না। ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এইসব ভেবে পেটের বিরুদ্ধে বাকি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একজোট হলো। তারা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করল যে তারা আর পেটের জন্য কোনো কাজ করবে না। দেখুক এবার কেমন মজা!

সেই মতো পা আর খাবারের সন্ধানে যায় না। কিন্তু অন্য কাজে যায়। হাত সেও মুখে খাদ্য তুলে দেয় না। সে কেবল অন্য কাজ করে। মুখ খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। দাঁত খাদ্যবস্তু আর চিবোতে পারবে না বলে দিল।

এভাবে দু'তিনদিন কেটে গেল। সবাই মনে মনে ভাবল, কেমন জব্দ হয়েছে পেট বাবাজী! আরও দুদিন এভাবেই কেটে গেল।

প্রথমেই পায়ের মনে হলো, কী ব্যাপার! এত দুর্বল লাগছে কেন? মনে হচ্ছে হেঁটে যাবারও ক্ষমতা নেই। শরীরটা কেমন যেন কাঁপছে। কই, এরকম তো আগে কখনো হয়নি!

হাতেরও মনে হলো সে যেন শক্তি পাচ্ছে না। নড়বার কোনো ক্ষমতাই নেই। মাথা তো নিজেকে তুলতেই পারছে না। নাক বলছে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। দাঁত বলছে তার দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছে। সবারই একই অবস্থা।

তারা আবার সব এক জায়গায় হলো। অনেক আলোচনার পর সবাই বুঝতে পারল যে খাদ্যের অভাবেই এই অবস্থা। খাদ্য না থাকায় পেট তার পরিপাক বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বুঝতে পারল, পেটে খাবার থাকলেই সবারই পুষ্টি লাভ হয়। তারফলে সবাই শক্তি পায়। সেই শক্তির বলে সবাই নিজের নিজের কাজ ঠিকমতো করতে পারে।

এবার তাদের মনে হলো, এতদিন তারা মনে করত বাইরের খাদ্য জোগাড় করতে কেবলমাত্র তাদেরই পরিশ্রম করতে হয় আর বিনা পরিশ্রমে পেট সে সবই ভোগ করে।

কিন্তু এবার তারা বুঝল যে ওই খাদ্যে তাদেরও প্রয়োজন। পেট কোনো কাজ করে না তা নয়। তাদের নিজেদেরও সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন আছে। তারা যেমন পেটকে সাহায্য করে, পেটও তেমনই সবাইকে পুষ্টি জোগায়। তারা সবাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ সুস্থ থাকতে হলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই নিজের নিজের কাজ করতে হবে। নইলে কেউ বেঁচে থাকতে পারবে না। নিজেরা ঝগড়া করলে, লাভ কারও নয়। বরং ক্ষতিই হবে। এজন্য সকলে মিলেমিশে থাকতে হবে। সবাইকে নিজের নিজের কাজ করতে হবে। এতেই মঙ্গল। সবাই মিলে একসঙ্গে চলতে হয়, তাহলেই সকলের কল্যাণ।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

ডিব্রু সাইখোয়া

অসম রাজ্যের ডিব্রুগড় ও তিনসুকিয়া জেলায় অবস্থিত এই জাতীয় উদ্যান। উদ্যানটি উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও লোহিত নদী এবং দক্ষিণে ডিব্রু নদী দ্বারা বেষ্টিত। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম জলাভূমি সংবলিত বন। ৪২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। ১৯৯৯ সালে বনভূমিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উদ্যানটি অনেক বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই উদ্যানে ৩৬ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ৪০০-র বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। এখানে রয়েছে বিরল প্রজাতির সাদা ডানাওয়ালা কাঠবর্ণ হাঁস।

এসো সংস্কৃত শিখি-৪৬

পুংলিঙ্গে

সঃ – **তে** (সে – তারা)

সঃ কঃ ? (সে কে?)

তে কে ? (তারা কারা?)

সঃ বালকঃ – **তে বালকাঃ** (সে বালক– তারা বালক)

অভ্যাস কুর্মঃ--

সঃ বৃদ্ধঃ – তে বৃদ্ধাঃ। সঃ নায়কঃ – তে নায়কাঃ। সঃ সৈনিকঃ – তে সৈনিকাঃ। সঃ ব্রাহ্মণঃ – তে ব্রাহ্মণাঃ।

প্রয়োগ কুর্মঃ

বিদূষকঃ, রক্ষকঃ, লক্ষকঃ, সেবকঃ,সঞ্চালকঃ, গৃহস্থঃ, সৌচিকঃ, পোষকঃ, তরুণঃ, অভিভাবকঃ, প্রবন্ধকঃ।

ভালো কথা

ঠাকুমার পশুপ্রেম

আমার ঠাকুমা খুব পশুপাখি ভালোবাসে। এই শীতে আমাদের লালির তিনটে ছানা হয়েছে। ওরা এখন সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়ায়। সন্ধ্যায় আর সকালে শীতে কুঁই কুঁই করে। ঠাকুমা ওদের জন্য জামা তৈরি করে পরিয়ে দিয়েছে। লালির জন্যও পুরনো কাপড় দিয়ে একটা জ্যাকেট তৈরি করেছে। লালিকে সকালে পরিয়ে দেয়। রাত্রিবেলা লালি আর ওর তিনটে ছানাকে চট দিয়ে বানানো লেপ দিয়ে ঢেকে রাখে। ঠাকুমার দুটো বেড়ালও আছে। রাত্রিবেলা ওরা ঠাকুমার বিছানায় ঠাকুমার লেপের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে।

সোনালি মহান্তি, বরাবাজার, সপ্তম শ্রেণী, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) লো স না চ	(১) কে বি য় ন জ ত
(২) ত র্ষি শ কী	(২) বো ঘ ল ব রা য়া

৯ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) আবহাওয়া (২) উচ্চপদাধিকারী

৯ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) উচ্চফলনশীল (২) অজ্ঞাতপরিচয়

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, ই বি, মালদা। (২) বর্ণিনী সরকার, বি এস রোড, মালদা। (৩) অনিশ দাস, গল্ফগ্রিন, কল-৯৫ ।(৪) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পঁচিশ ডিসেম্বর, ভবিষ্যৎ ভারতের সাধনায় ধ্যানমগ্ন স্বামীজী

তিলক সেনগুপ্ত

ডাইনে-বামে-পশ্চাতে ঢেউ আর ঢেউ, অগণিত অনন্য; মহাসাগরের বুকে মিশে যেতে চায় সাগর আর উপসাগর— অনাদিকাল থেকে তাদের অভিসার যাত্রা। সুনীল জলধি থেকে সন্তানসম ভারতবর্ষের আবির্ভাব; মহাকালের সেই মহান অধ্যায় দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক আশ্চর্য নক্ষত্র; তার অতীত আর ভবিষ্যৎ মেলাবেন ধ্যানে বসে। পাশেই সমুদ্রতনয়া কন্যাকুমারী। বড়দিনের প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, তারপর মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরসঙ্গমে ৫০০ মিটার সাঁতরে ভারতীয় ভূখণ্ডের শেষবিন্দু সেই মহা শিলাখণ্ডে পৌঁছলেন তিনি; উত্তরাস্য বসি দিব্যভাবাবেশে অনুভব করেছিলেন, 'আমাদের প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নবযৌবনসম্পন্না এবং সর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়া রত্ন সিংহাসনে আরূঢ় হইতেছেন।' অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য স্বামীজীর ধ্যান। ধ্যানমগ্নতায় একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো— ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর।

১৮৯২ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর। স্থান কন্যাকুমারী। ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। দিনটি বড়দিন। সেই দিনই তিনি ভারতের উত্থানের রূপটি দেখেছিলেন। যার ফলশ্রুতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, সেই শুভদিন, শুভক্ষণ। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ সেদিন বুঝেছিল ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করার ক্ষমতা রাখে। আবার, যে খ্রিস্টমত মানুষকে 'পাপী' বলে, সেই মতের প্রতিবাদ কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবও। জীবের মাঝেই শিবের বাস। তাইতো মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম; সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ; পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই মানুষের মধ্যে আছে।

স্বামীজীর প্রতিটি কাজই শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত। বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সূত্র, স্বামীজী তার ভাষা। তিনি জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমহামণ্ডলে ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ। তাই বড়দিনের মতো দিনটিতেই 'সনাতনী-বীজ' বপন করে দিলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পথ প্রদর্শক। এটা ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্তিরই সাধনা; যা ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন এবং ১ জানুয়ারি ইংরেজিবর্ষের প্রথম দিন রূপে উৎসবকে অতিক্রম করে ভারতবাসীর কাছে সৌভাগ্যের চৈতন্য লহর আছড়ে পড়ে বিশেষ ভাবে। তাই এই দিনে বরং বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ, মনন ও পূজন জরুরি। প্রয়োজন

ফঃ ৬

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজী যুগলবন্দির আরাধনা। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী যে ধর্মকে আঁকড়ে বেঁচে আছে, সেই ধর্মের প্রত্যক্ষ সাকার রূপ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন চৈতন্য প্রবাহের ১ জানুয়ারি দিনটিতে। যা কল্পতরু দিবসরূপে পরিচিত। বাঙ্গালি তথা বিশ্ববাসীকে এই শুভদিনে চৈতন্য জাগরণের আশীর্বাদ করেছিলেন। তাই তাঁর অবতারত্বে বাঙ্গালি অবগাহন করতে চেয়েছে চৈতন্যের সমুদ্র। এখন প্রশ্ন হলো, বেছে বেছে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে ভারতবর্ষে 'কল্পতরু'-র ভাব-আয়োজন কেন করলেন? কেনই-বা কলোনিয়াল ফেস্টিভ্যালের মেজাজে প্রতিস্পর্ধী হিন্দুত্বের বাতাবরণ তৈরি হলো? কেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য হয়ে ১ জানুয়ারির মধ্যে ব্যাপক ছোঁয়া লাগলো? এসব কী নিছকই এক একটি দিন? নাকি একটি প্রতিস্পর্ধী প্রভাব থেকে সনাতনী হিন্দু সমাজকে উত্তরণে নিয়ে যাওয়ার ঐশী- প্রয়াস?

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে আর দুটি উদাহরণ আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও দৃঢ় করবে। প্রথম, ১৮৮৬ সালের বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথ-সহ (১৩ পৌষ, ১২৯৩) ন'জন গুরুভাই হুগলীর আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। অন্যদিনও তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তার বেশ কয়েকদিন আগেই পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৮৬ সালেই আগস্ট মাসে ঠাকুরের শরীর যায়। সেদিন অশ্বত্থতলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন গভীর ধ্যানে, তারপর ঈশ্বর আলোচনা।

পরবর্তীকালে পুরীতে গিয়ে সেই বাবুরাম মহারাজই কেন খ্রিস্টান পাদরিদের ধর্মপ্রচারের জনসমাগমকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং স্বধর্ম চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য 'হরিবোল হরিবোল হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে উত্তাল করেছিলেন এবং উপস্থিত মানুষকে তাতে শামিল করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর তাতে সফলও হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মসমাজের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিন্দু বিধবা আশ্রমের জন্য তিনি বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে টাকা তুলে পাঠিয়েছেন কেবল খ্রিস্টান ধর্মান্তরিত ভারতীয় বিদুষী মহিলা রমাবাইয়ের তৈরি বিধবা আশ্রমকে ঔচিত্য দেখানোর জন্য। কারণ এই মহিলা-সহ অন্যান্য খ্রিস্ট-মতাবলম্বী ও মিশনারিরা গলা ফাটিয়ে ভারতীয় বিধবাদের দুঃখের অতিরঞ্জন করতেন, স্বামীজীর তা পছন্দ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনীয়া। শিকাগোতে তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারের জন্যেই গিয়েছিলেন। তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়েও দেন, ভারতবর্ষ কখনোই অধ্যাত্মসম্পদে দরিদ্র নয়, দরিদ্র অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানে। তাই ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে এক ভাষণে বলেন, 'তোমরা খ্রিস্টানেরা পৌত্তলিকদের আত্মাকে উদ্ধার করবার জন্য তাদের কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাতে খুবই উৎসাহী; কিন্তু বল দেখি অনাহার ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেহগুলো বাঁচানোর জন্য কোনো চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ খিদেয় মৃত্যুমুখে পড়ে, কিন্তু তোমরা খ্রিস্টানরা কিছুই করনি। তারা ভাত চাইছে আর আমরা তাদের পাথরের টুকরো তুলে দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হলো তাকে অপমান করা।' স্বামীজী অন্য ধর্ম থেকে ভাব নেবার ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন। যিশুর সামাজিক সাম্যনীতি তাঁর প্রাণ স্পর্শ করে থাকবে; জগতের কল্যাণের জন্য যে ত্যাগ দরকার হয়, তার রসদও যিশুখ্রিস্টের মধ্যে তিনি পেয়ে থাকবেন।

ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার পর মানুষ স্বভাবতই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রমণ করতে মনস্থ হয়, কখনও কখনও ঔপনিবেশিক শক্তির মান্য ধর্মকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে স্বামীজীও হয়তো সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের ধর্মীয় সেরা দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন।

স্বামীজী জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার ধারায় ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ, তাই বড়দিনের মতো দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনের বীজ বপন করে দিলেন তিনি। এটা কলোনিয়াল প্রভাবমুক্তিরই সাধনা, ২৫ ডিসেম্বরকে অতিক্রমের সাধনা। এই দিনে বরং বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মনন ও পূজন জরুরি। জরুরি শ্রীরামকৃষ্ণ- স্বামীজী যুগলবন্দির আরাধনা। খ্রিস্টের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই যিশুখ্রিস্টকে আবিষ্কার করার সাধনা হিন্দুদের শুরু করা উচিত। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

ফিরহাদের মন্তব্যে প্রতিবাদে সরব বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা যায়। কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্য ও দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের শতাংশের হিসেব তুলে ধরেন। সেই প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন যে উপরওয়ালার আশীর্বাদে একদিন সংখ্যাগুরু হবে সংখ্যালঘুরা। তার এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন।

ধনধান্য অডিটোরিয়ামে 'ফিরহাদ ৩০' নামক একটি অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা ৩৩ শতাংশ, কিন্তু দেশে আমরা ১৭ শতাংশ। আমাদের সংখ্যালঘু বলা হয়, কিন্তু আমরা নিজেদের সংখ্যালঘু বলে মনে করি না। আমরা মনে করি উপরওয়ালার আশীর্বাদে একদিন আমরা সংখ্যাগুরুর চেয়েও বেশি সংখ্যক হতে পারি। উপরওয়ালার আশীর্বাদে এটা আমরা হাসিল করব। এখন আমাদের সঙ্গে অন্যায় হলে রাস্তায় বিচারের দাবিতে মোমবাতি হাতে মিছিল করি। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন আমরা বিচার দেব। আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যা নিয়েও বিতর্কিত মন্তব্য করেন ফিরহাদ। তিনি বলেন— কলকাতা হাইকোর্টে সংখ্যালঘু ২-৩ জন বিচারপতি রয়েছেন। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। আমাদেরকে ওই জায়গায় পৌঁছাতে দেওয়া হয়নি। আগামীদিনে কলকাতা হাইকোর্টে আমরাই সবথেকে বেশি বিচারপতি হিসেবে থাকব এবং বিচার করব।

বাংলাদেশের উদ্বেগজনক আবহে ফিরহাদের এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ও বিষাক্ত মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার ফিরহাদের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন— এটা কি ঘৃণা ভাষণ (হেট স্পিচ) নয়? ভারতে বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরির একটা ব্লু-প্রিন্ট। ইন্ডিজোটের শরিকরা কেন চুপ? ফিরহাদের এই মন্তব্য নিয়ে তাদের মতামত জানানোর চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।' ফিরহাদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন তিনি। বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য এক্স-হ্যান্ডেলে লিখেছেন— পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য অনুপ্রবেশে উৎসাহ দেবে। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ফিরহাদের মন্তব্যের নিন্দা করে বলেন— 'সাম্প্রদায়িক কারা এটা আর বলতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গ যাতে বাংলাদেশে পরিণত হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য পদক্ষেপ করতে হবে'। ফিরহাদের মন্তব্যের নিন্দা করেছেন অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির প্রদেশ অধ্যক্ষ পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন— 'ভারতীয় সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রীপদে থাকা ব্যক্তির মুখে এটি একটি কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য। এরকম একটা পদে থেকে এহেন মন্তব্য অনুচিত।'

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন অব্যাহত। গত ৫ ডিসেম্বর জেহাদিরা পিটিয়ে খুন করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক কার্যকর্তার মাকে। ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি এলাকায়। মৃতার নাম চুমকি দাস। তাঁর পুত্র প্রান্ত দাস হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক। সংবাদসূত্রে জানা গিয়েছে যে এদিন রাতে প্রান্ত দাসের বাড়িতে হানা দেয় বেশ কয়েকজন জেহাদি। বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে তারা। ভাঙচুরের পাশাপাশি চলছিল লুঠপাট। সেসময় বাড়িতে ছিলেন না প্রান্ত। প্রান্তর মা চুমকি দাস হামলাকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে হামলাকারীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই হিন্দুসমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। এর আগে হিন্দু সন্ন্যাসী প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে জেলে ভরে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এমন হয় যে প্রাণনাশের আশঙ্কায় চিন্ময় প্রভুর জামিন মামলার শুনানিতে কোনো আইনজীবী দাঁড়াতে পারেননি। একাধিক আইনজীবীকে মারধর করা হয়, হুমকি দেওয়া হয়।

গত ৭ ডিসেম্বর ঢাকার তুরাগে ইসকনের মন্দিরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় জেহাদি-মোল্লাবাদীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছেন ইসকনের কলকাতা শাখার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। তাঁর দাবি— 'এদিন মধ্যরাতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি।' রাধারমণ জানিয়েছেন— বাংলাদেশের নামহট্টর ইসকনের আরও একটি কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ এবং মন্দিরের ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র পুরোপুরি পুড়ে যায়। কেন্দ্রটি ঢাকায় অবস্থিত। এদিন রাত দু'টো থেকে তিনটের মধ্যে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি ঘটে। মন্দিরটি তুরাগ থানার আওতাধীন ধৌর গ্রামে অবস্থিত হরে কৃষ্ণ নামহট্ট সঙ্ঘের অধীনে পড়ে। মন্দিরের পিছনে টিনের ছাদ তুলে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়। মন্দিরের ঠিকানা— বাড়ি নম্বর ২, রাস্তা নম্বর ৫, ওয়ার্ড ৫৪, ঢাকা উত্তর। এই নিয়ে বাংলাদেশে চতুর্থ ইসকনের মন্দির আক্রান্ত হলো বলে জানিয়েছেন রাধারমণ। তিনি বলেন— 'গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার রাতেও আমাদের জগন্নাথ মন্দিরে বোমা মারা হয়েছিল। এক সপ্তাহ আগে একটি নামহট্ট মন্দিরে হামলা হয়েছে। তিন-চারদিন আগেও ওখানে মন্দিরে ঢুকে ভাঙচুর করেছে জেহাদি সন্ত্রাসীরা। এবার ঢাকায় আরও একটি মন্দিরে ঢুকে আগুন ধরানো হলো। আমাদের ভক্তরা খুব আতঙ্কে রয়েছেন বাংলাদেশে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত মাসে চট্টগ্রামে চিন্ময় প্রভুর শাস্তি এবং ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে পাথরঘাটা মেথরপট্টিতে মন্দির ও ঘরবাড়িতে, হরিশচন্দ্র মুন্সেফ লেনে শান্তনেশ্বরী কালীমন্দিরে, সতীশবাবু লেনে জগবন্ধু আশ্রম-সহ বেশ কয়েকটি মন্দিরে হামলা চালানো হয়। গত ৩ ডিসেম্বর রাতে সুনামগঞ্জে হিন্দুদের শতাধিক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ-সহ একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও লুঠপাট করা হয়। জেহাদি হামলায় দোয়ারাবাজার লোকনাথ মন্দিরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হিন্দু সাধু সেজে গোরুপাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৯ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের বরাবাঁকি এলাকা থেকে সাত জন গোরুপাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। গোরুপাচারকারীদের পুলিশ ঘিরে ফেললে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে অপরাধীরা। পুলিশও পালটা গুলি চালালে দু'জন অপরাধী আহত হয়। সাতজন অপরাধীর নাম হলো— সারোয়ার, গুফরান, উমর, অঙ্কুল গুপ্তা, ইরফান, নবিজান ও আজিজ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে পুলিশকে ধোঁকা দিতে একজন হিন্দু সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল ঘটনাস্থল হতে ধৃত উমর। হাতে একটি

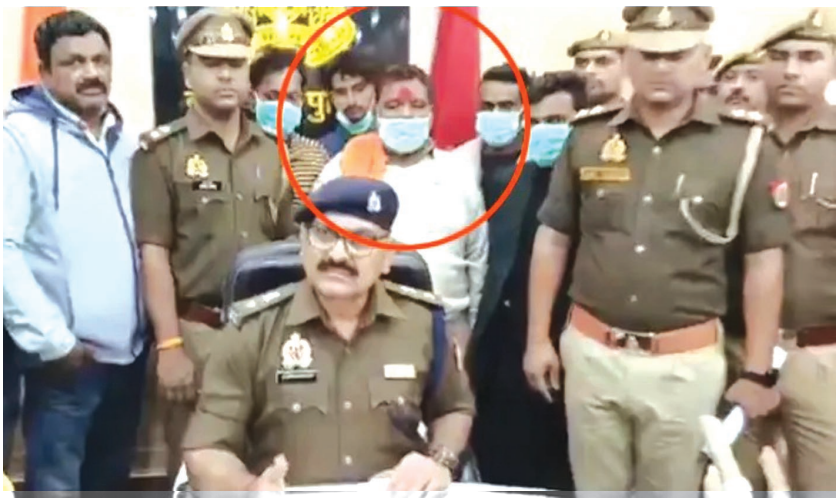

ত্রিশূল-সহ, কপালে তিলক কেটে, গলায় একটি গেরুয়া উত্তরীয় পরেছিল সে। গোরুপাচারকারীর এই বেশভূষা সংবলিত ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। সংবাদসূত্রের খবর হলো, বরাবাঁকির সাত্রিখ থানার পুলিশ খবর পায় যে গুড়িয়া ঘাট রোড এলাকা থেকে জঙ্গলের দিকে একটি গাড়ির সন্দেহজনক গতিবিধি দেখা যাচ্ছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং সেই পিক-আপ ভ্যানটিকে আটক করে। গাড়িটি ছিল ছুরি, কাটারি, বেল্ট ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রে ভর্তি। পুলিশ গাড়ি টি ঘিরে ফেলার আগে অপরাধীরা গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। পুলিশ গাড়িটির তল্লাশি শুরু করতেই, তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে। পুলিশ পালটা গুলি চালালে সারোয়ার ও গুফরান জখম হয়। অন্য অপরাধীরা ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। বরাবাঁকির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দক্ষিণ) অখিলেশ নারায়ণ সিংহ সংবাদমাধ্যমকে জানান যে সারোয়ার ও গুফরানের থেকে দু'টি বেআইনি পিস্তল এবং পাঁচটি কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা দাগি অপরাধী ও গোরুপাচারকারী, তাদের প্রত্যেকের নামে বিভিন্ন থানায় ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে। তাদের থেকে একটি লোহার চপার, একটি ছুরি, তিনটি লাঠি, একটি পিক-আপ ভ্যান, একটি ইকো ভ্যান এবং একটি মোটরসাইকেল পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি জানান।

কাশীর মুসলিমবহুল এলাকায় শতাব্দী প্রাচীন মন্দির উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৬ ডিসেম্বর কাশীর একটি মুসলিমবহুল এলাকা মদনপুরা থেকে একটি প্রাচীন মন্দির উদ্ধার হয়েছে। সম্ভলে প্রাচীন মন্দির উদ্ধারের পর কাশীতে এই মন্দির উদ্ধারের খবরও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সারা ফেলেছে। মন্দির উদ্ধারের খবর স্থানীয় দশাশ্বমেধ থানায় দেওয়া হয়েছে। যদিও সনাতন রক্ষক দলের সভাপতি অজয় শর্মা মন্দিরকে ঘিরে কোনো বিবাদ তৈরি হয়নি বলেই জানান।

মন্দির থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, এই মন্দিরটি আজ থেকে ২৫০ বছর আগে নির্মিত। এটি পরম সিদ্ধিপদ সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং এর কাছেই সিদ্ধার্থ কূপ থাকার উল্লেখ পাওয়া গেছে। এই এলাকায়

মুসলমান সংখ্যা বেড়ে গেলে স্থানীয় হিন্দুরা বাড়ি ঘর বিক্রি করে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মন্দিরটিও পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য অনুসারে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও সেখানে পূজাপাঠ চলত।

১৬ ডিসেম্বর সামাজিক মাধ্যমে হওয়া পোস্ট থেকে মন্দিরের খবরটি সামনে আসে। একপাশে আবর্জনা স্তূপ করে রাখা ছিল। মন্দিরটির ভিতরে মাটি ভর্তি ছিল এবং বাইরে থেকে তালা বন্ধ। তবে কারা মাটি ভর্তি করেছে আর কারাই-বা তালা মেরেছে, তা জানতে পারা যায়নি। কিছু হিন্দু সংগঠন শীঘ্রই মন্দির খুলিয়ে পূজাপাঠ আরম্ভের দাবি জানিয়েছে।

জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ টেনে সংসদে বিরোধী জোটকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছে ভারতীয় সংবিধানের ৭৫তম বার্ষিকী। গত ১৪ ডিসেম্বর লোকসভায় সেই সংক্রান্ত বিতর্কের শেষে তাঁর জবাবি ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন বিরোধী দল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তিনি। লোকসভায় তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে কংগ্রেস বারবার ভারতীয় সংবিধানকে আক্রমণ করেছে। ৭৫ বার তারা সংবিধান সংশোধন করেছে। জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইন্দিরা গান্ধী সেই সময় দেশের নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি বলেন যে জরুরি অবস্থার সময়ে নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে জেলে ভরা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। নিজের গদি বাঁচাতে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন।

নেহরু পরিবারের চরিত্র উন্মোচন করে মোদীজী বলেন যে এই একটি পরিবার সবরকমভাবে দেশের সংবিধানকে আঘাত করে গিয়েছে। বাক্-স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার জন্য এই পরিবারটি ভারতীয় সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করেছে। এইসব পদক্ষেপের ফলে সংবিধান যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁদের অসম্মান ও অপমান করা হয়েছে। একটি পরিবারের স্বার্থরক্ষায় একের পর এক সংবিধান সংশোধন ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাদের বিচারধারার ওপর আঘাত হেনেছে। এমনকী সংসদকে এড়িয়ে ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের মতো কাণ্ডও ঘটিয়েছে কংগ্রেস। ভারতীয় সংসদে পাশ না করিয়েই তারা সংবিধানে যুক্ত করেছিল জম্মু-কাশ্মীর সংক্রান্ত ৩৫-এ ধারা। জাতি ও ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ নিয়েও সংবিধান দিবসের বিতর্কে কংগ্রেসকে বেআব্রু করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ক্ষমতার লোভে ভোটব্যাংককে তুষ্ট করতে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের ভয়ংকর খেলা খেলছে কংগ্রেস। জাতি-ধর্মকে হাতিয়ার করে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির কংগ্রেসি রাজনীতি দেশের পক্ষে ভয়াবহ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে 'সংবিধান' শব্দটাই কংগ্রেসের মুখে শোভা পায় না। কারণ তারা নিজেদের দলের সংবিধানটিই মানে না। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরীর সঙ্গে তাঁর দল যে আচরণ করেছিল, সেটিও উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে।

ইউনিফর্ম সিভিল কোডের প্রসঙ্গও এদিন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন যে ধর্মভিত্তিক আইন বাতিল করা উচিত। কে এম মুন্সি বলেছিলেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড আবশ্যিক। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে আমরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এনডিএ সরকারের সময়কালীন সংবিধান সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এনডিএ সরকারও সংবিধান সংশোধন করেছে দেশকে সংগঠিত করতে, দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, দেশের অখণ্ডতা রক্ষার্থে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দুদের ওপর চলছে অত্যাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গাড়িতে সনাতনী ভজন শোনায় আক্রান্ত দুই। আহতরা ভর্তি কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে। এই দৃশ্য বাংলাদেশের নয়, পশ্চিমবঙ্গের বুকে ঘটে চলেছে এই ধরনের ঘটনা। গত ১৩ ডিসেম্বর সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনার ভিডিয়ো পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

নিজের পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল বিরোধী একটি সভা চলছিল। সেই সময়ে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। তাতে বাজছিল সনাতনী ভজন। সেই গাড়িটির ওপর চড়াও হয় সভায় আসা লোকজন। কোনো প্ররোচনা ছাড়াই গাড়িটি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। রীতিমতো তাণ্ডব চলে কাঁথি বাসস্ট্যান্ডে। গাড়িতে থাকা যাত্রীদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

ভিডিয়োটি পোস্ট করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর বক্তব্য, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে ভিডিয়োটিই যথেষ্ট, কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি কাউকেই। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন নিয়ে আগাগোড়া সোচ্চার তিনি। একাধিক জায়গায় শুভেন্দুবাবু সেই বিষয়ে প্রতিবাদমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান করে চলেছেন। বাংলাদেশের এই অস্থিরতার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের এই ভিডিয়োটি পোস্ট করে ফের প্রতিবাদমুখর হলেন তিনি।

রানাঘাটে মাটির তলায় খনিজ জ্বালানির ভাণ্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত এপ্রিল মাসেই রানাঘাটে খনিজ জ্বালানির উৎস পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। তারপর থেকে এই আট মাসে তা নিয়ে কতটা কাজ হয়েছে তা জানতে চেয়ে সেখানকার সাংসদ জগন্নাথ সরকার মোট ৪টি প্রশ্ন করেন। ১) রানাঘাটে খনিজ জ্বালানির পরিমাণ কত এবং পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক শক্তি উৎপাদনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে? ২) খনিজ জ্বালানির অনুসন্ধানের বিষয়ে কতটা কাজ এগিয়েছে এবং কতদিনে রানাঘাটের ভাণ্ডার থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে পারে? ৩) রানাঘাটের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? ৪) খনিজ উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে কতটা কাজ হয়েছে এবং কতদিনে সেই কাজ শেষ হবে?

কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী জানান, ১৫ এপ্রিল রানাঘাটে খনিজ জ্বালানির অস্তিত্বের খবর আসে। কিন্তু কতটা পরিমাণ হাইড্রোকার্বন রয়েছে তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। এর জন্য ৯ মে ২০২৭-এর মধ্যে সমীক্ষার সময়সীমা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এছাড়াও স্থানীয়দের মতামত, পরিবেশগত ছাড়পত্রও প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার জমিতে খননের জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর ছাড়াও একাধিক জায়গায় খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও রাজ্যের অনুমতি না পাওয়াই খননকার্য আরম্ভ করা যায়নি। এই খনিজ সম্পদ উদ্ধার হলে রাজ্যের পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

রামমন্দির পরিসরে আরও ছয় মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র পরিসরে আরও ছ'টি মন্দিরের কাজ সমাপ্তির পথে। গত ২২ জানুয়ারি ২০২৪, পৌষ শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে শ্রী রামমন্দিরে শ্রীরামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগামী বছর ২০২৫ সালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয়। সেই পোস্টের মাধ্যমে জানানো হয়, শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির শ্রী রামলালার প্রতিষ্ঠার বর্ষ পূর্তি সমাগত। শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা-দ্বাদশী সাড়ম্বরে পালনের পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

এর সঙ্গে মন্দির নির্মাণের অন্তিম পর্যায়ের কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। পরিসরে নির্মীয়মাণ শিবমন্দির, সূর্যমন্দির, দুর্গামাতা মন্দির, গণেশ মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির ও হনুমান মন্দিরের স্পষ্ট স্বরূপ প্রস্ফুটিত হচ্ছে এবং দ্রুত শেষপর্যায়ের নির্মাণ কার্য চলছে। নবনির্মিত মন্দিরগুলির ছবিও সেই পোস্টে দেওয়া হয়।

২০২৫ সালে পৌষ শুক্ল দ্বাদশী তিথি অনুযায়ী ১১ জানুয়ারি সেই দিন নির্ধারিত হয়েছে। বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে এবার আগের থেকে বহু ভক্তের সমাগম হবে বলে ট্রাস্টের কার্যকর্তারা অনুমান করছেন। বিপুল সমাগমের কারণে নিবাস ব্যবস্থা, ভোজন ব্যবস্থা, যাতায়াত, সুরক্ষা, ট্র্যাফিক প্রভৃতি নানান বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

সাধারণ ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের আসারও সম্ভাবনা রয়েছে। সেই মতো এখন থেকেই তার পূর্ব প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ওই বিশেষ দিনে কী ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ভারতের তেরঙ্গায় পা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ : মুখ খুললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভারতীয় জাতীয় পতাকার ওপর পা রাখার ছবি বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ স্থলে এমনভাবে ভারতের পতাকা রাখা হয়েছে, যাতে পা না রেখে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন ঘটনা যে জেহাদিদের তরফে ইচ্ছাকৃত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ঘটনায় বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। উঠেছে নিন্দার ঝড়। সংবাদে প্রকাশ, ভারতের জাতীয় পতাকাকে অসম্মান করার কারণে ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছেন যে সংখ্যালঘু ও নাগরিকদের রক্ষা করা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব। সংখ্যালঘু-সহ বাংলাদেশের সব নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের ওপর বর্তায়। ঢাকায়

ভারতীয় হাইকমিশন সেদেশের সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। তিনি বলেন—'বিষয়টিতে আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। অন্তর্বর্তী সরকারকে অবশ্যই সমস্ত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হবে। চরমপন্থী বক্তব্য, হিংসা ও উসকানির ঘটনাবৃদ্ধিতে আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। এই ঘটনাগুলিকে শুধুমাত্র মিডিয়ার অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা এবং সেদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যথিত সেই দেশের হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিক সমরেন্দ্র কুমার মণ্ডল। বার্ধক্য তাঁকে চেপে ধরলেও ক্ষোভে ফুঁসছেন তিনি। একদা অখণ্ড বঙ্গভূমির অংশ হলো পূর্ববঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই এক ডাকে দৌড়ে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য লড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রাণ। সেই লড়াই ও ত্যাগের প্রতিদান হিসেবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি হিংসা-অত্যাচার এবং ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা মেনে নিতে পারছেন না বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করা প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিক।

'এক দেশ-এক নির্বাচন' বিলে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'এক দেশ-এক ভোট' নীতি কার্যকরের পথে আরও এক ধাপ এগোল ভারত সরকার। গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা এই নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি বিল অনুমোদন করেছে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন উচ্চ- পর্যায়ের কমিটি 'এক দেশ-এক ভোট' প্রণয়নের বিষয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। শীতকালীন অধিবেশনে এই বিলটি সংসদে পেশ হয়। 'এক দেশ-এক নির্বাচন' প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর লোকসভায় ১২৯তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল। এর সঙ্গে আরও তিনটি আইন (দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন টেরিটরিজ অ্যাক্ট, ১৯৬৩; দ্য গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি অ্যাক্ট, ১৯৯১; দ্য জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রিঅর্গানাইজেশন অ্যাক্ট, ২০১৯) সংশোধনের জন্য পেশ হয়েছে তিনটি সংশোধনী বিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, ঘন ঘন নির্বাচন দেশের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এই প্রসঙ্গে বলেন—'একযোগে নির্বাচন হলে উন্নয়নের গতি দ্রুত হবে এবং খরচও কমবে'।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে বিল পেশের পরে একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হবে। এই কমিটি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং তাদের মতামত সংগ্রহ করবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন একটি বিশেষ কমিটি আগেই 'এক দেশ-এক নির্বাচন' সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিলটি তৈরি করা হয়েছে বলে সংবাদসূত্রের খবর। এনডিএ-র শরিক দলগুলি, যেমন— নীতীশ কুমারের জেডি(ইউ) এবং চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। যদিও ইন্ডিজোটের অন্তর্গত বিরোধী দলগুলি এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদের অভিযোগ, এই প্রস্তাবে কেন্দ্রের শাসক জোট রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবে। বিরোধীদের মতে, বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন হওয়ার যে পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত, তা দেশের জনবৈচিত্র্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একযোগে নির্বাচন তাদের মতে এই কাঠামোকে দুর্বল করতে পারে। সরকারের মতে, 'এক দেশ- এক নির্বাচন' নীতি বার বার নির্বাচনের ফলে সৃষ্ট খরচ এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা কমাতে সহায়ক হবে। তবে এটি কার্যকর করতে বিভিন্ন আইনি এবং সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সংসদের সমর্থনের পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দলের সম্মতির ওপরে এই নীতি প্রণয়নের সফলতা নির্ভর করছে।

নর্মদামাতার পরম ভক্ত সন্ত সিয়ারাম বাবার মহাপ্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মোক্ষদা একাদশী এবং গীতাজয়ন্তীর পুণ্য তিথিতে ব্রহ্মলীন হলেন ভারতের প্রসিদ্ধ সন্ত সিয়ারাম বাবা। গত ১১ ডিসেম্বর সকালে ১১০ বছরের তপোসিদ্ধ জীবনের অবসান ঘটে।

সপ্তম শ্রেণীতে উঠে পড়া ছেড়ে হিমালয়ে চলে যান তপস্যা করতে। বহু বছর তপস্যার পর মধ্যপ্রদেশে নিজেরই খরগোন জেলার ভট্টিয়া গ্রামে নর্মদাতটে সাধনা আরম্ভ করেন। তিনি সম্পূর্ণ জীবন নর্মদা মাঈয়ার

প্রতি সমর্পণ করেন। সেখানেই আশ্রম করে সাধনা চালিয়ে যান। তিনি ১২ বছর মৌনব্রত পালন করেন এবং ১০ বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। তিনি ভগবান হনুমানের পরম ভক্ত ছিলেন। নিয়মিত রামায়ণ পাঠ দিনচর্যার অভিন্ন অঙ্গ ছিল।

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কেবলমাত্র কৌপীনই একমাত্র পরিধেয় ছিল। অতি সাধারণ আহার গ্রহণ। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী, সিদ্ধ পুরুষ সিয়ারাম বাবা কখনও ১০ টাকার বেশি দক্ষিণা গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যুতে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

সম্ভলে আবিষ্কৃত শ্রীহনুমান ও শিবমন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে মাহমুদ খান সরাই এলাকায় একটি তালাবন্ধ বাড়ির ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হলো একটি শিবমন্দির। ১৯৭৬ সালে সংঘটিত একটি দাঙ্গার আগে পর্যন্ত এই বাড়িটি ছিল একটি হিন্দু পরিবারের বাসভবন। পরে তা হস্তান্তরিত হয়। তারপর থেকে দীর্ঘদিন তালাবন্ধ হয়ে পড়ে ছিল বাড়িটি। গত ১৪ ডিসেম্বর

অবৈধ দখলদারি এবং বিদ্যুৎ চুরি রুখতে এদিন সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ এলাকায় একটি বড়ো মাপের অভিযান চালায় জেলা প্রশাসন। এই অভিযান চলাকালীন এই বাড়িটির মধ্যে একটি শিবমন্দিরের সন্ধান পায় উত্তরপ্রদেশ স্থানীয় প্রশাসন। মন্দিরটি ৪৬ বছর ধরে তালাবন্ধ ছিল। জেলাশাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া, জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণকুমার বিষ্ণোইয়ের তত্ত্বাবধানে রাইসাত্তি, নখাসা, হিন্দুপাড়া খেড়া এবং দীপা সরাই প্রভৃতি এলাকায় এই অভিযান চলে। এই অভিযানে উদ্ধার হওয়া মন্দিরটি পরিষ্কার করা হয় এবং বাড়িটির কাছে একটি প্রাচীন কুয়োর মধ্যে খননকার্যও শুরু হয়। কুয়োটির ওপর ছিল একটি বড়ো আচ্ছাদন। জেলাশাসক জানিয়েছেন যে বাড়িটির মালিকানা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া চলছে। বাড়িটির মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁদের হাতে বাড়িটি তুলে দেওয়া হবে এবং বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্দিরটির প্রাচীনত্ব নির্ধারণের জন্য কার্বন ডেটিং পরীক্ষার ক্ষেত্রে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সাহায্য নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

এদিন সম্ভলে রাস্তা ও ড্রেনগুলির উপর বেআইনি দখলদারি এবং বিদ্যুৎ চুরির মোকাবিলায় বড়ো মাপের অভিযানে নামে জেলা প্রশাসন। একাধিক মসজিদ-সহ প্রায় ৩০০টি বাড়িতে বিদ্যুৎ চুরি ধরা পড়ে। একটি মসজিদে বিদ্যুৎ চুরির মাধ্যমে ৫৯টি পাখা, একটি ফ্রিজ, একটি ওয়াশিং মেশিন এবং ২৫-৩০টি লাইট পয়েন্ট চলতে দেখা যায়। রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নবীন গৌতম জানিয়েছেন যে বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাঁরা। বিদ্যুৎ চোরদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা ছাড়াও তাদেরকে জরিমানা করা হবে বলেও তিনি জানান। বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের নিরাপত্তায় এলাকা জুড়ে দুই প্ল্যাটুন পুলিশ মোতায়েন করে জেলা প্রশাসন। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীশ চন্দ্র জানিয়েছেন যে মন্দিরের জায়গা-জমি দখল করে অনেকেই বেআইনিভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে বলে জানা গিয়েছে। এদিনের তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হওয়া মন্দিরটিতে ভগবান শিব এবং শ্রীহনুমানের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে বলে তিনি জানান। বাড়িটিতে আগে ছিল হিন্দুদের বসবাস। হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান এবং সরকারি সম্পত্তির ওপর বেআইনি দখলদারি কোনোভাবে বরদাস্ত করা হবে না, দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া চলবে বলে জানিয়েছে সম্ভল জেলা প্রশাসন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পর্কপ্রমুখ সুব্রত রায় এবং মালদহ জেলার শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ দেবব্রত রায়ের মাতৃদেবী শান্তিময়ী রায় গত ১৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।